গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা | ২২ জুন ২০২১ (ডিজিটাল) | www.ganadabi.com

বাংলা ভাগের যে কোনও ষড়যন্ত্র সর্বশক্তি দিয়ে রুখব

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার অপচেষ্টার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৫ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ, কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি বিধানসভা নির্বাচনে পর্যুদস্ত হওয়ার পর বিভাজনের ঘৃণ্য রাজনীতি করার জন্য উত্তরবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করতে চাইছে। আমরা এই অপপ্রয়াসের তীব্র নিন্দা করছি।

আমাদের দেশে স্বদেশি আন্দোলনের যুগে অবিভক্ত বাংলার যে সংগ্রামী ঐতিহ্য ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে, তা আমরা সকলেই গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি। সেই গর্বের বাংলাকে দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে একদিকে ব্রিটিশের চক্রান্ত, অন্য দিকে কংগ্রেসের সমর্থন ও হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্রে একবার বিভাজিত হতে হয়েছে, যার ক্ষত আজও আমাদের বেদনার সাথেই বহন করতে হচ্ছে।

১৯৫৬ সালে স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস সরকার বাংলা-বিহার সংযুক্তির মাধ্যমে বাংলার গৌরবময় ঐতিহ্যকে বিপন্ন করার হীন অপপ্রয়াস চালায়, যা বৎসরাধিক কাল ধরে উত্তাল গণআন্দোলনের মাধ্যমে বাংলার মানুষ প্রতিরোধ করে।

সকলের এ কথাও স্মরণে আছে, গোর্খাল্যান্ডের নাম করেও বেশ কয়েকবার পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করার চেষ্টা হয়েছিল, যা পশ্চিমবাংলার মানুষ মেনে নিতে পারেনি।

এখনও বেশ কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ও রাজনৈতিক দল তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য অথবা ক্ষমতা দখলের নিকৃষ্ট স্বার্থে এবং শাসক শ্রেণির নির্মম শোষণকে টিকিয়ে রাখতে জনগণকে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, আদিবাসী, নানা উপজাতি, পাহাড়ি অঞ্চল, সমতল ইত্যাদির নাম করে মানুষের ঐক্যকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

বর্তমানে শাসক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য যে কোনও অজুহাতে যদি আবার বাংলাকে ভাগ করার কোনও রকম ষড়যন্ত্র হয়, সমস্ত শক্তি দিয়ে আমরা তা প্রতিরোধ করার অঙ্গীকার করছি। সাথে সাথে, সারা দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী ঐতিহ্য, গৌরবময় সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

সরকারি মদতে জ্বালানি তেলের ব্যবসায় বেপরোয়া লুঠ

অতিমারি এবং দীর্ঘ লকডাউনের পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি সরকার পেট্রল-ডিজেলের ভয়ানক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে কর্পোরেট হাউসগুলিকে নির্মম ভাবে জনগণের রক্ত শোষণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। সংগঠিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পরিবেশ না থাকায় জনসাধারণকে বাধ্য করা হচ্ছে অগ্নিমূল্যে পেট্রল-ডিজেল কিনতে। পেট্রল-ডিজেলের এই মূল্যবৃদ্ধি উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলে প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে ব্যাপক হারে।

লিটার পিছু পেট্রলের দাম হয়েছে বর্তমানে মুম্বাইতে ১০১.৫৭ টাকা, ডিজেল ৯৩.৬৪ টাকা। দামের এই ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত। কারণ হিসেবে চিরকালীন সেই ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে সরকার। ৭ জুন কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, 'ভারতে প্রায় ৮০ শতাংশ জ্বালানিই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম বেড়ে চলেছে'। এই যুক্তির বিরুদ্ধে যেন কারওর একটা কথাও বলার নেই! অথচ, এর থেকে জলজ্যান্ত মিথ্যা আর কিছু হয় না।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়ে চলার চিত্রটা বাস্তবে কী? মোদি সরকার যখন ক্ষমতায় এল, অর্থাৎ ২০১৪ সালের জুন মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি ১০৯.১০ ডলার। সেই সময়ে দেশে খুচরো পেট্রলের দাম ছিল লিটার পিছু ৭১.৫১ টাকা, এবং ডিজেল ৫৭.২৮ টাকা (দ্য উইক ডট ইন, ২৪ জুন '২০)। এখন, অর্থাৎ ২০ মে '২১, আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৬৫.০৫ ডলার (আনন্দবাজার, ২৩ মে, '২১)। এখন দেশে খুচরো তেলের দাম কত? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পেট্রল ১০১.৫৭ টাকা এবং ডিজেল ৯৩.৬৪ টাকা লিটার প্রতি (বর্তমান, ৮ জুন,'২১)।

জ্বালানি ও ভোজ্য তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দিল্লির সিংঘু বর্ডারে কৃষকদের বিক্ষোভ। ১৮ জুন

তা হলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়েছে, নাকি এখন বিপুল পরিমাণ কমেছে? তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে খুচরো তেলের দাম বাড়ছে কেন? এ প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তরটিকে চাপা দেওয়ার জন্য সরকারকে জলজ্যান্ত মিথ্যার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। জেনেশুনে এই কর্মটি করছে কেন সরকার? ভেতরের গূঢ় রহস্য হল, প্রতিদিন হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা কর্পোরেট তেল কোম্পানিগুলি এবং তার সাথে সরকার গোপন বোঝাপড়া করে লুঠ করে চলেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ওএনজিসি ২০২০ সালের প্রথম কোয়ার্টারে নিট মুনাফা করেছে ৭ হাজার ৪৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ গত বছরই মুনাফা তুলেছে অন্ততপক্ষে ২৮,১৭২ কোটি টাকা। একই ভাবে '২০-'২১-এ আইওসি মুনাফা করেছে ২১,৭৬২ কোটি টাকা (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ডট কম ২০ মে, '২১)। রিলায়েন্সের গত এক বছরে নেট মুনাফা বেড়েছে ১০৮ শতাংশ (পিটিআই,৩০ এপ্রিল,'২১)। আদানির বেড়েছে ২৬.২৫ শতাংশ (ঐ,৬

দুয়ের পাতায় দেখুন

সরকার সঙ্কটের দায় চাপাচ্ছে শ্রমিকের ঘাড়ে, বাড়ছে বেকারত্ব

অসংখ্য মৃত্যু, চিকিৎসা না পাওয়া, লকডাউনের যন্ত্রণার মাঝে অতিমারির দ্বিতীয় দফাতেও বিষাক্ত সাপের মতো মাথা তুলেছে কাজ না থাকার সমস্যা। শুধু গত এপ্রিল-মে, এই একমাসে কাজ চলে গেছে দেড় কোটি মানুষের। জানুয়ারি থেকে হিসাব করলে সংখ্যাটা হয় ২ কোটি ৫৩ লক্ষ। এই হিসাবের বাইরে রয়ে গেছে অসংগঠিত ক্ষেত্রের ছোট মিস্ত্রি, দিনমজুর, মোটবাহক, ফেরিওয়ালাদের মতো কোটি কোটি মানুষ, কোভিড অতিমারি ও লকডাউন যাঁদের কাছ থেকে উপার্জনের সুযোগ ছিনিয়ে নিয়েছে।

এমনিতেই দেশ বেকার সমস্যায় জেরবার। গত বছরের কোভিড-সঙ্কট সেই সমস্যার তীব্রতা এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। গত লকডাউনে কাজ হারিয়েছিলেন সরকারি হিসেবেই ১০ কোটি মানুষ। বছরের শেষে লকডাউন উঠে যাওয়ার পর দেখা গেল এঁদের মধ্যে দেড় কোটি আর কাজ ফিরে পাননি। আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সমীক্ষা দেখিয়েছিল, গত বছরের লকডাউনে পরিযায়ী শ্রমিকদের ৮১ শতাংশ কাজ হারিয়েছিলেন। 'স্ট্র্যান্ডেড ওয়ার্কার্স অ্যাকশন নেটওয়ার্ক' সংস্থার সমীক্ষা দেখাচ্ছে, এ বছর কেন্দ্রীয় ভাবে না হলেও বিভিন্ন রাজ্যে অল্পদিনের যে লকডাউনগুলি হয়েছে, তাতে ইতিমধ্যেই কাজ চলে গেছে ৮১ শতাংশ পরিযায়ী শ্রমিকের। বলা বাহুল্য, এই সবগুলি হিসাবই খাতায়-কলমে। বাস্তব সংখ্যাটা অতি অবশ্যই এর কয়েকগুণ বেশি।

অতিমারির প্রকোপে কাজ হারালেন যাঁরা, লক্ষ করলে দেখা যাবে, তাঁদের অধিকাংশই অস্থায়ী কর্মী তথা চুক্তিশ্রমিক। অত্যন্ত কম বেতন দিয়ে এঁদের শ্রমশক্তি নিংড়ে নেয় দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। ফলে এই দুর্দিনে খেয়ে-পরে বাঁচার মতো সঞ্চয়ের জোর নেই এঁদের। অধিকাংশের জন্যই কোনও সামাজিক সুরক্ষারও ব্যবস্থা রাখেনি

দুয়ের পাতায় দেখুন

জ্বালানি তেলে বেপরোয়া লুঠ

একের পাতার পর

মে, '২১)। কত বড় মিথ্যাকে আড়াল করার চেষ্টা করছে তা বোঝা যাবে গতবছর যখন আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম শূন্যে নেমে আসে সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল-ডিজেলের দাম একটি পয়সাও কমায়নি। স্ট্র্যাটেজিক অয়েল রিজার্ভের নামে ভারত সরকার যে সেই সময় কয়েক কোটি ব্যারেল অশোধিত তেল বিভিন্ন রাজ্যের রিজার্ভারগুলিতে জমিয়ে রেখেছে, সেগুলি এখনও এই বিপুল কর সহ এমন বিপুল দামে বিক্রি করা হচ্ছে। এর পরেও আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার তত্ত্ব দাঁড়ায় কি? এ তো রীতিমতো দেশের নিরন্ন বুভুক্ষু কোটি কোটি মানুষকে আরও শুষে নেওয়া, লুটে নেওয়া। যে সরকার জনগণের ওপর এমন নির্মম লুণ্ঠন চালিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পুঁজি বছরে দ্বিগুণ করার ব্যবস্থা করে দেয়, সেটা যে জনগণের সরকার নয়, এর পরেও কি তা বুঝতে অসুবিধা থাকে!

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী বলেছেন, ৮০ শতাংশ তেল বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। কেন হচ্ছে? দেশের তৈলখনিগুলোকে ব্যবহার না করে এই আমদানি নীতি চলে আসছে সেই ৭০ এর দশকে ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকেই এইভাবে সরকারি ওএনজিসি-কে কার্যত অকেজো করে দিয়ে। বিদেশের বাজারের উপর নির্ভরশীল না হলে দেশীয় উৎপাদন ব্যয় কম হত এবং সাধারণ মানুষ সুরাহা পেতেন। এখনও যতটুকু তেল দেশে উৎপন্ন হয়, মূল্যমানের সমতার কথা বলে কেন তা আন্তর্জাতিক বাজারের সমান দামে বিক্রি করা হচ্ছে? অর্থাৎ সাধারণ মানুষকে শোষণ করে যেভাবে পারো মুনাফা লুটে নাও।

সংবাদে আরও প্রকাশ, এ বছরই ১২ জুন পর্যন্ত ৪৮ বার তেলের দাম বেড়েছে। কমেছে মাত্র চার বার। গত সাত বছরে নরেন্দ্র মোদির আমলে দেশে পেট্রলে প্রায় ৮০০ শতাংশ এবং ডিজেলে প্রায় ২৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় শুল্ক বেড়েছে। তথ্য বলছে, কেন্দ্র ও রাজ্য মিলে এখন দেশে তেলের উপর ট্যাক্স আদায় করছে ৬৩ শতাংশ (দ্য হিন্দু ডট কম, ৩১ মে, '২১)। একদিকে এই চড়া ট্যাক্স, অন্যদিকে তেল কোম্পানিগুলির বিপুল মুনাফাই এ ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির কারণ। কী বিপুল পরিমাণ অর্থ জনসাধারণের কাছ থেকে কৌশল করে এবং সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে তুলে নেওয়া হচ্ছে তা কল্পনার অতীত।

সর্বদাই সরকার বলে থাকে জ্বালানি তেল এবং রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি দিতে দিতে তারা ফতুর হয়ে যাচ্ছে। তাই ভর্তুকি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে হবে। এই কি সেই ফতুর হওয়ার নিদর্শন? কোথায় ভর্তুকি? উল্টে তো সরকার ও তেল কোম্পানিগুলি তেল ব্যবসায় আয় করছে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা! স্ট্র্যাটিজিক অয়েল রিজার্ভ এবং রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানিগুলিকে বেসরকারি মালিকদের কাছে বেচে দিচ্ছে। তেল ব্যবসায় ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নির ছাড়পত্র দিয়ে দিচ্ছে। ফলে বেসরকারি তেল কোম্পানিগুলিকে বিপুল লুটের খোলাখুলি সুযোগ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আম্বানি-আদানিরা বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহদের মাথায় কেন ক্ষমতার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে, তা বুঝতে আর অসুবিধা হয় কি?

দেশের কল্যাণ, স্বচ্ছ ভারত, সব কা সাথ সব কা বিকাশ ইত্যাদি বহুশ্রুত মিষ্টি ভাষণের আড়ালে দেশের মানুষকে নিয়ে এ এক মহা মারণ-যজ্ঞ চলছে। বিপুল পরিমাণ তেলের মূল্যবৃদ্ধি সকল জিনিসপত্রের মূল্যমানে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। সাধারণ দেশবাসীর নাগালের ধরাছোঁয়ার বাইরে বাস্তবে। আবার এর প্রভাব পড়ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে। যার ফলে বিদ্যুতের মাশুল বাড়ছে, এবং বিদ্যুতের সাহায্যে উৎপাদন ও পরিবহন ক্ষেত্রেও ব্যয় বাড়াচ্ছে। তার নিটফল আবার ঘুরপথে এসে ওই জনসাধারণের ঘাড় থেকেই তা আদায় করা হচ্ছে।

এদিকে বাস মালিকরা উসখুস করছে এবং প্রায়শই সরকারের উপর চাপ দিচ্ছে ভাড়া বাড়াতে হবে। অর্থাৎ না বাড়ালে পরিবহণ ব্যবস্থা অচল করে দেবো। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিকে অজুহাত করে বাস ও ট্যাক্সির ভাড়া আরও অনেকগুণ বাড়ানোর যৌক্তিকতা সরকার হাওয়ায় ভাসিয়ে রেখে ইতিমধ্যেই মালিকপক্ষকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে ফেলেছে। কেবল লকডাউন আলগা হওয়ারই অপেক্ষা। বাস মালিকরা হইচই বাধিয়ে, ধর্মঘট করে, তুলকালাম করে তুলবে, সাধারণ মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে হয়রান করবে, যাতে ত্রাহি ত্রাহি রবে সরকার কিছু একটা ভূমিকা নিতে বাধ্য হচ্ছে এই ভাব দেখিয়ে ভাড়া বৃদ্ধি পরিমণ্ডলটি সৃষ্টি করা যায়। এবং সেই কারণে সংবাদে প্রকাশ, 'পরিবহণ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, মালিকদের দাবি নিয়ে তিনি কমিটি করে তিন মাসের মধ্যে সিদ্ধান্তকরবেন' (সংবাদপ্রতিদিন, ৮ জুন, '২১)। অর্থাৎ আরেকটি আক্রমণের খড়্গ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে সরকার।

জ্বালানি ও ভোজ্য তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মধ্যপ্রদেশের গুনায় বিক্ষোভ

হোসিয়ারি শ্রমিকদের সরকার ঘোষিত মজুরি বৃদ্ধির দাবি এআইইউটিইউসি-র

হোসিয়ারি শ্রমিকদের সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি অনুসারে অবিলম্বে রেটবৃদ্ধির দাবিতে ১৮ জুন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের শ্রম দপ্তরের অ্যাডিশনাল লেবার কমিশনারকে অনলাইনে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ইউনিয়নের পক্ষে নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, মধুসূদন বেরা, নেপাল বাগ, তপন কুমার আদক প্রমুখ অভিযোগ করেন, গত ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি অনুসারে শ্রমিকদের রেট বৃদ্ধি হলেও তারপর পাঁচবার ন্যূনতম মজুরি বেড়েছে। ১ জুলাই আবার একবার মজুরি বৃদ্ধির কথা ঘোষিত হবে। অথচ পাঁচবার মিলে মাসিক ১,১০৪ টাকা সরকার ঘোষিত মজুরি বৃদ্ধি হলেও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হয়নি। ইউনিয়নের জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা বলেন, অবিলম্বে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি অনুসারে রেট বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ডেপুটি লেবার কমিশনার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারকেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

বাড়ছে বেকারত্ব

একের পাতার পর

সরকার। আর অসংগঠিত ক্ষেত্রের হকার, ফুটপাতের দোকানদার, মুটে-মজুর বা ঠিকামিস্ত্রিদের মতো দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষদের কাছে মাস পোহালে নির্দিষ্ট আয় বা সরকারি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা তো আকাশের চাঁদ। অথচ 'গতরে খেটে' খাওয়া ছাড়া বাঁচবার দ্বিতীয় পন্থা নেই তাঁদের। এই অবস্থায় অসংখ্য মানুষ পরিবার-পরিজন সমেত তলিয়ে যাচ্ছেন দারিদ্রের সীমাহীন অন্ধকারে। আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, গতবারের অতিমারি দেশের ২৩ কোটি মানুষকে দারিদ্রসীমার নিচে ঠেলে দিয়েছে। এ বছর সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে চলেছে, তা এখনও হিসাবের আওতায় আসেনি। কিন্তু সেই সংখ্যা যে আতঙ্কজনক— চারপাশে কাজ খুঁজে খুঁজে হন্যে হয়ে যাওয়া মানুষের ভিড়ের দিকে চোখ পড়লেই তা বেশ বোঝা যায়।

দেশের এই বিপুল সংখ্যক মানুষ, অতিমারি থেকে কোনও মতে প্রাণে বাঁচলেও রুজি-রোজগারের অভাবে যাঁরা আজ মরতে বসেছেন, অভুক্ত সন্তান-পরিজনের মুখে খাবার তুলে না দিতে পারার যন্ত্রণা যাঁদের প্রতি মুহূর্তে তাড়া করছে, 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর প্রশস্তবক্ষ প্রধানমন্ত্রী তাঁদের জন্য কী ব্যবস্থা করেছেন? গত বছর লকডাউনে ত্রাণপ্যাকেজ হিসাবে যে ২০ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার, তার কতটুকু এঁদের জন্য ব্যয় করা হয়েছে? বিনামূল্যে রেশনে যে ৫ কেজি চাল কিংবা গম আর ডাল দেওয়ার ব্যবস্থা করে দায় সেরেছিল সরকার, নভেম্বর মাস থেকে তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জনধন যোজনায় মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাসে ৫০০ টাকা করে দেওয়ার কথা বলেছিল সরকার। কিন্তু তিন মাস পরেই সেটুকুও বন্ধ করে দেওয়া হয়। যে একশো দিনের কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের কিছু মানুষ উপার্জনের মুখ দেখেন, গত বছর অতিমারির পর বাধ্য হয়ে সেই প্রকল্পে বরাদ্দ কিছুটা বাড়িয়েছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এ বছরে বাজেটে আবার ওই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে দুর্দশার কালো মেঘ খেটে-খাওয়া মানুষগুলির জীবন ছেয়েই রেখেছিল। এর উপর এ বছর অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ায় আজ তাঁদের জীবনযন্ত্রণার সীমা নেই। অথচ পরিসংখ্যান বলছে, দেশের শতকোটিপতি বৃহৎ কর্পোরেটদের সম্পদের পরিমাণ গত বছরের লকডাউনের সময়েই ৩৫ শতাংশ বেড়ে গেছে। এ থেকে তো এ কথাই প্রমাণ হয় যে ব্যাপক ছাঁটাই ও পদ বিলোপ করে মুনাফার পরিমাণ বিপুল বাড়িয়ে নেওয়া ছাড়াও সরকারি ত্রাণ প্যাকেজের বড় অংশটা থেকে ফায়দা তুলেছে হাতে-গোনা এই পুঁজিমালিকরাই! তা না হলে এঁদের সম্পদের এই বিপুল বাড়বাড়ন্ত সম্ভব হল কোন ম্যাজিকে! শুধু একচেটিয়া মালিকদের বিপুল মুনাফা কামানোর সুযোগ করে দেওয়াই নয়, অতিমারির সুযোগে সরকার শ্রম সংস্কারের নামে শ্রমিকদের কাজের ন্যূনতম স্থায়িত্ব, তাদের সুরক্ষার সমস্ত অধিকারই প্রায় কেড়ে নিয়েছে। নতুন শ্রমকোডে স্থায়ী কাজ, নির্দিষ্ট বেতন এ সব কিছু প্রায় অবলুপ্ত হবে— এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

অতিমারির আক্রমণে চূড়ান্ত দুর্দশায় রয়েছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ যে খেটে-খাওয়া মানুষ, তাঁদের শ্রমের উপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে গোটা দেশ। অথচ সরকার তাঁদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বটুকু পর্যন্ত আজ আর পালন করতে রাজি নয়। দেশের আসল মালিক পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে সরকারের যাবতীয় দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র পুঁজিমালিকদের প্রতি। তাই অতিমারিতে যেখানে কোটি কোটি বেরোজগার মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো জোটানোর চেষ্টায় মাথা কুটে মরছেন, তখন অক্সফ্যামের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের মাত্র ১০০ জন বৃহৎ শিল্পপতির সম্পদ আকাশ ছুঁয়েছে। তার পরিমাণ এতটাই যে এই কয়েকমাসের বাড়তি টাকাটা দেশের ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ দরিদ্রতম মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকের হাতে আসতে পারে ৯৪ হাজার ৪৫ করে টাকা!

এই সরকারের কাছে তাই খেটে-খাওয়া মানুষের আশা করার কিছু নেই। সঠিক নেতৃত্বে একজোট হয়ে লাগাতার গণআন্দোলনের চাপে দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনে বাধ্য করতে হবে এই সরকারকে। ছিনিয়ে নিতে হবে নিজেদের অধিকার। পাশাপাশি চূড়ান্ত অন্যায়ের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে একটু একটু করে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। তা না হলে মেহনতি মানুষের শ্রম নিংড়ে মুনাফা লুটতে লুটতেই খারাপ সময় এলে তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার খেলা চালিয়ে যাবে শোষক পরজীবী পুঁজিপতিরা। আর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সরকার ত্রাণ-প্যাকেজ দেওয়ার নামে ভরিয়ে তুলতে থাকবে পুঁজিমালিকদের মুনাফার সিন্দুক।

প্যারি কমিউনের সংগ্রাম প্রসঙ্গে

আজ থেকে ১৫০ বছর আগে ১৮৭১ সাল ছিল প্যারি কমিউনের ঐতিহাসিক সংগ্রামে উত্তাল হয়েছিল ফ্রান্স তথা সমগ্র ইউরোপ। বুর্জোয়া শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে ১৮ মার্চ বিপ্লবী কেন্দ্রীয় কমিটি প্যারিসের ক্ষমতা দখল করে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র কমিউন প্রতিষ্ঠা করে। কমিউন গুণগত ভাবে ছিল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমেই কমিউন প্রশাসন থেকে আমলাতন্ত্রকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। ভাড়াটে সেনাবাহিনীর পরিবর্তে জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। কমিউন সদস্য, কর্মচারী, অফিসারদের বেতনের ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেয়, যা একজন দক্ষ শ্রমিকের বেতনের মোটামুটি সমান। আট ঘণ্টা শ্রমসময় নির্দিষ্ট করে দেয়। শ্রমিকদের উপর জরিমানা ধার্য করা, রুটির কারখানায় রাতের শিফটে কাজ নিষিদ্ধ করা হয়। শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে শ্রমকমিশন গঠিত হয়। যে সব মালিক এতদিন শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে আসছিল তাদের সম্পত্তিচ্যুত করার আদেশ দেওয়া হয়। বেকার শ্রমিকদের কাজ ও সাহায্যের ঘোষণা করা হয়। অফিসার, সেনা অফিসার, বিচারপতি সকলের নির্বাচিত হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। সব ধরনের নির্বাচিত ব্যক্তি অযোগ্য প্রমাণিত হলে নির্বাচকদের হাতে তাদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়। চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। শিক্ষা হয় অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। এই প্রথম কমিউন শাসনে শ্রমিকরা মুক্তির স্বাদ পায়।

কিন্তু নানা কারণে কমিউনকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। ৭২ দিন পর ২৮ মে বুর্জোয়া সরকার অপরিসীম বর্বরতায় নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে কমিউনকে ধ্বংস করে। বিচারের নামে প্রহসন ঘটিয়ে হাজার হাজার কমিউনার্ডকে হত্যা করে বুর্জোয়ারা বিপ্লব দমন করে। এই লড়াইকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে কার্ল মার্কস তাঁর চিন্তাধারাকে আরও ক্ষুরধার করেন। শ্রমিক বিপ্লবের প্রচলিত ভ্রান্ত তত্ত্বগুলিকে আদর্শগত সংগ্রামে পরাস্ত করে প্যারি কমিউনের লড়াই মার্কসবাদের অভ্রান্ত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। কমিউনার্ডদের অসীম বীরত্ব ও জঙ্গি লড়াই সত্ত্বেও কমিউনের পতন দেখায়, শ্রমিকবিপ্লবের জন্য সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ও সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব অবশ্য প্রয়োজন। প্যারি কমিউনের ইতিহাস জানা সমস্ত মার্কসবাদীর অবশ্য কর্তব্য। ২০১১ সালে গণদাবীতে সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আরও কিছু সংযোজন করে সেটিকে সম্পাদিত আকারে ধারাবাহিক ভাবে আমরা প্রকাশ করছি। এ বার দ্বিতীয় কিস্তি। — সম্পাদক, গণদাবী

(২)

রাজতন্ত্র ও পুরাতনতন্ত্রের উগ্র সমর্থক দশম চার্লস ক্ষমতায় বসে আইনসভা ভেঙে দিয়ে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে, ভোটাধিকার আরও সঙ্কুচিত করে ফ্রান্সে স্বৈরশাসন কায়েম করেন। ধর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্রে যাজকদের এবং অভিজাতদের যে ক্ষমতা ও সম্পত্তি বিপ্লব পরবর্তী শাসনে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তিনি তা আবার ফিরিয়ে আনেন। চার্লস ১৭৮৯ এর আগেকার বুরবোঁ রাজতন্ত্রের শাসন পদ্ধতি ফিরিয়ে আনতে চান। ফলে ১৮৩০ এর জুলাই মাসের গণঅভ্যুত্থানে আবার ফ্রান্সে ক্ষমতার বদল হয়। পরিবর্তন হয় রাজবংশের। টিকে যায় রাজতন্ত্র। বুরবোঁ রাজাদের পরিবর্তে তাঁদেরই আত্মীয় অর্লিয়ানিস্ট পরিবারের রাজা লুই ফিলিপ ক্ষমতায় বসেন। এই সরকার সম্পর্কে মার্কস বলেছেন, "লুই ফিলিপের রাজত্বে ফরাসি বুর্জোয়ারা শাসন চালায়নি। চালিয়েছিল তাদের একটি অংশ— ব্যাঙ্কের কর্তা, ফাটকাবাজারের রাজারাজড়া, রেলপথের রাঘববোয়াল, কয়লা আর লোহার খনি ও বনজঙ্গলের মালিক, আর তাদের সঙ্গে জড়িত ভূস্বামীদের একটি অংশ, অর্থাৎ তথাকথিত ফিনান্স অভিজাতবর্গ।" এই সরকারে প্রকৃত শিল্প-বুর্জোয়ারা বিরোধী পক্ষ হিসাবেই থেকে যায়। সব স্তরের পেটিবুর্জোয়া এবং কৃষকরাও রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত থেকে যায়।

লুই ফিলিপের রাজত্বে অসন্তুষ্ট শ্রমিক ও নিপীড়িত মানুষের বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। ১৮৪৫ সালের পর থেকে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকটের আবর্তে পড়ে গোটা ফ্রান্স। আলুর মড়ক ও অজন্মা গোটা ফ্রান্স জুড়ে কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের জন্ম দেয়।

আগেকার বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের পক্ষে প্রশাসন সহ সবক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক গাঁটছড়াকে পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা ঐতিহাসিক কারণেই সম্ভব হয়নি। স্বভাবতই শিল্পমালিকরা লড়াই করেছে এই সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে তুলে একশো শতাংশ বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থা চালু করা এবং তারই সাথে নিজেদের গোষ্ঠীকে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে পরিণত করার জন্য। প্রজাতন্ত্রে বিশ্বাসী উদারনৈতিক পেটিবুর্জোয়াদের সমর্থন স্বাভাবিক কারণেই এরা পায়। শোষণে নিষ্পেষিত শ্রমিক মেহনতি মানুষ ও কৃষকরাও রাজতন্ত্রের বিরোধী হয়ে উঠেছিল। শাসক বুর্জোয়া গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এ লড়াইয়ে তারা সামিল হওয়ায় ফরাসি দেশের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব সংগ্রামের সৃষ্টি হয়।

শিল্প মালিকরা চাইছিল নির্বাচন ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতার অংশীদার হতে এবং সম্ভব হলে তখনও টিকে থাকা সামন্ততান্ত্রিক যোগসূত্রগুলি খতম করে রাজতন্ত্রকে পুরোপুরি বুর্জোয়া নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত করতে। কিন্তু সংগ্রামে মেহনতি মানুষ অংশগ্রহণ করায় ঐটুকু দাবির ভেতরেই সংগ্রামকে আটকে রাখা যায়নি। ফলে বুর্জোয়াদের র‍্যাডিক্যাল অংশ যারা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী তাদের হাতে

শিল্পীর চোখে প্যারি কমিউনের লড়াইয়ে শ্রমিক-জনতা

ইউরোপ, বিশেষত ইংল্যান্ডের শিল্পসঙ্কট মারাত্মক প্রভাব ফেলে ফ্রান্স জুড়ে। সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে ছোট পুঁজির মালিকেরা। বুর্জোয়াদের একটা বড় অংশও দেউলিয়া হয়ে যায়। কলকারখানা বন্ধ হতে থাকে। ফ্রান্স জুড়ে শুরু হয় শ্রমিক ধর্মঘট। ফরাসি সমাজের বৃহত্তম অংশের অনাস্থা ঘোষিত হয় লুই ফিলিপ সরকারের বিরুদ্ধে। শিল্পমালিক বুর্জোয়ারা লুই ফিলিপের সংসদে ছিল সংখ্যালঘু। এই পরিস্থিতিতে শাসনক্ষমতা বহির্ভূত এই বুর্জোয়া গোষ্ঠী ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবি তোলে। ১৮৪৮ এর ফেব্রুয়ারি মাসে বুর্জোয়া শ্রেণির সংস্কারকামী আন্দোলন শ্রমিকদের ব্যাপক যোগদানের ফলে সর্বাত্মক বিপ্লবে পরিণত হয়। শ্রমিক শ্রেণির বৈপ্লবিক মেজাজ অনিচ্ছুক বুর্জোয়া শ্রেণিকে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করে।

নেতৃত্ব চলে যায়। শ্রেণি চেতনার অভাবের ফলে মেহনতি মানুষ মনে করে, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই শোষণের অবসান সূচিত করবে। জনতা বিপুল বিক্রমে লড়াই করে। সরকারের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রক্ষীবাহিনী এমনকী সৈন্যবাহিনীকে পর্যন্ত জনতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করানো যায়নি। সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়। সফল হয় ১৮৪৮ এর ফেব্রুয়ারি সংগ্রাম।

২৫ ফেব্রুয়ারি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পতনের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা হয় দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র— সোস্যাল রিপাবলিক। গঠিত হয় এক অস্থায়ী সরকার। প্যারিস জুড়ে দেওয়ালে দেওয়ালে শোভা পেতে থাকে স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের ঘোষণা। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এতদিনের গুটিকয়েক মাত্র বুর্জোয়া গোষ্ঠীর বদলে শ্রমিক, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া সহ ফরাসি সমাজের সব ক'টি শ্রেণিই রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে এসে পড়ে। অন্য দিকে নতুন সরকারের মন্ত্রীদপ্তরগুলি বুর্জোয়ারা নিজেদের নানা অংশের মধ্যে ভাগ করে নেয়। অস্থায়ী সরকারে শ্রমিক শ্রেণির দু'জন মাত্র প্রতিনিধি, লুই ব্লাঁ ও আলবের, কার্যত তাঁদের ক্ষমতাশূন্য করে রাখা হয়।

১৮৩০ এর জুলাইয়ে শ্রমিকেরা লড়ে পেয়েছিল বুর্জোয়া রাজতন্ত্র, '৪৮ এর ফেব্রুয়ারিতে তারা লড়ে পেল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র। মার্ক্স বললেন, "অস্থায়ী সরকারকে ও অস্থায়ী সরকার মারফত গোটা ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করে প্রলেতারিয়েত তৎক্ষণাৎ এক স্বাধীন পার্টি হিসাবে সামনের সারিতে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বানও সে জানায় সমস্ত বুর্জোয়া ফ্রান্সকে। সে যা জিতে আনল তা মোটেই তার মুক্তি নয়, তার বৈপ্লবিক মুক্তির জন্য লড়বার জায়গাটা।"

অস্থায়ী সরকারের শাসনে শ্রমিকরা অস্ত্রধারণের অধিকার পেল। ন্যাশনাল গার্ডে যোগদানেরও বাধা থাকল না। জীবিকার অধিকারের প্রতিশ্রুতি আদায় হল। বেকার শ্রমিকদের কাজ দেওয়ার জন্য গঠিত হল ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ। হাজারে হাজারে বেকার শ্রমিক ওয়ার্কশপের রেজিস্টারে নাম লিখিয়ে মাটি কাটা, রাস্তা বানানো, গাছ পোঁতার মতো ক্লান্তিকর একঘেয়ে কাজ করে যেতে থাকল। খোলা আকাশের নিচে শ্রমনিবাস— এই হল জাতীয় ওয়ার্কশপ। রাজনৈতিক চেতনায় অপরিণত প্রলেতারিয়েত এই সরকারকে তার নিজের মনে করল। ধরে নিল এই সরকার সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শে গঠিত এবং শ্রেণিনিরপেক্ষতার প্রতীক। প্রজাতন্ত্রকে আপন সৃষ্টি মনে করে প্যারিসের প্রলেতারিয়েত অস্থায়ী সরকারের এমন প্রত্যেকটি কাজকেই অভিনন্দিত করল যা বুর্জোয়া সমাজে সরকারের পাকা আসন প্রতিষ্ঠাতেই সহায়তা করল। বুর্জোয়াদের সম্পত্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় পুলিশের কাজে নিজেদের নিযুক্ত করতে রাজি হল। লুই ব্লাঁ[১] শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে মজুরি সংক্রান্ত বিরোধের মধ্যস্থতার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

তখনও ইউরোপ জোড়া বাণিজ্য সঙ্কট অব্যাহত। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব চালিত হয়েছে ফিনান্স আভিজাত্যের বিরুদ্ধে। এর ফলে ঘা খেল সরকারি ও ব্যক্তিগত ক্রেডিট। অস্থায়ী সরকারের আর্থিক অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে উঠল। এই অবস্থায় সরকার চাইল প্রজাতন্ত্রের বুর্জোয়া বিরোধী চেহারা ঘোচাতে। পুরনো বুর্জোয়া সমাজ রাষ্ট্রের কাছে যে হুন্ডি পেশ করেছিল তাকে মেনে নিয়ে অস্থায়ী সরকার নতি স্বীকার করল সেই সমাজেরই কাছে। রাষ্ট্রের পাওনাদারদের সব পাওনা সুদ সহ মিটিয়ে দিল। আর্থিক সঙ্কট মেটাতে সরকার ঘোষণা করল নতুন কর। না, ব্যাঙ্ক মালিক, সরকারের মহাজন বা শিল্পপতিদের উপর নয়, তা চাপল সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষকদের উপর।

আটের পাতায় দেখুন

১। লুই ব্লাঁ ফ্রান্সের কল্পবাদী সমাজতন্ত্রী নেতা। শ্রমিক শ্রেণির শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানবসমাজ মজুরির গোলামি থেকে মুক্তিতে বিশ্বাস করতেন না, মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর ষড়যন্ত্রেই তা ঘটবে বলে মনে করতেন।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ বিতরণ

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ত্রাণ বিতরণ এবং স্বাস্থ্যশিবির করা হয়। ১৩ জুন কোলাঘাটের সাহাপুরে ৬০ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে

এআইডিএসও, হলদিয়া

খাদ্য ও শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেয় এআইডিএসও। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি স্বপন জানা, দীপঙ্কর মাইতি প্রমুখ। ১৬ জুন এ আই কে কে এম এস এবং অ্যাবেকার যৌথ উদ্যোগে কাঁথির দেশপ্রাণ ব্লকের কালুয়া ও ডিহি মুকুন্দপুর গ্রামে শতাধিক ক্ষতিগ্রস্তকে ত্রাণদেওয়া হয়। কৃষক সংগঠনের পক্ষে জেলা সম্পাদক জগদীশ সাউ ও অ্যাবেকার পক্ষে জেলা নেতা পঞ্চানন দাস উপস্থিত ছিলেন।

কমসোমল ঃ এই সংগঠনের উদ্যোগে কোলাঘাটে ৬২ জন শিশু-কিশোরকে ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা ইনচার্জ সুদর্শন মান্না, গণেশ হুতাইত প্রমুখ। ১৯ জুন

কমসোমল, কোলাঘাট

অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের উদ্যোগে খেজুরির কাদিরাবাদ চরে ত্রাণ বিতরণ ও স্বাস্থ্য শিবির হয়। দুই শতাধিক মানুষকে ত্রাণ ও তিন শতাধিক মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য শিবির পরিচালনা করেন ডাঃ এন কে প্রধান, অধ্যাপকদের মধ্যে ত্রাণশিবিরে উপস্থিত ছিলেন মঙ্গল কুমার নায়ক, উত্তম খাটুয়া, রুম্পা সাহু প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন ও বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ঃ ২০ জুন এই দুই সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে মন্দারমণির সিলামপুরে ১৭৫ জনের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের পক্ষে নারায়ণ বর্মন, আকসারুল ইসলাম খান ও শিক্ষক সংগঠনের পক্ষে প্রভাত পাল, সৌমেন প্রধান প্রমুখ। ওইদিনই কোলাঘাটে বিপিটিএ-র পক্ষ থেকে ৭০টি পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা, মেঘনাথ খামরই প্রমুখ। কিশোর সংগঠন কমসোমলের উদ্যোগে দীঘার শৌলাতে ৪০ জন শিশু-কিশোরকে খাদ্য ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা ইনচার্জ সুদর্শন মান্না, রেখা মাইতি প্রমুখ।

বাঁকুড়া ঃ ৭ জুন অ্যাবেকার উদ্যোগে শালতোড়া ব্লকের বারকোনা গ্রামে ৫০টি পরিবারের হাতে শুকনো খাবার, ফল, মাস্ক, সাবান, স্যানিটাইজার তুলে দেওয়া হয়। ১০ জুন সাতনার দুবরাজপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত কার্তিক বাউরির বাড়ি গিয়ে অ্যাবেকার নেতৃবৃন্দ পরিবারের হাতে ত্রাণ তুলে দেন। সেইসাথে তাঁর পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও একজনকে চাকরি দেওয়ার দাবি নিয়ে স্থানিয় এসএম অফিস, আরএম অফিস এবং ডিএম অফিসে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ ও ছাতনা ব্লক সম্পাদক বীরেন মণ্ডল।

ব্যাঙ্ক কর্মী ইউনিয়ন ঃ ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের তাণ্ডবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ এলাকার ঘরবাড়ি, পথঘাট ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এলাকাবাসীর জীবন-জীবিকাও সঙ্কটাপন্ন।

এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যাঙ্ককর্মী সংগঠনের পক্ষ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পাথরপ্রতিমার এল-প্লটের শ্রীধর নগর, শ্রীমতী নগরের প্রায় ১৫০টি পরিবারে ১৩ জুন ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন

করা হয়। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল বালতি, সাবান, সর্ষের তেল, ডাল, ছাতু, দুধ সহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য ১০টি উপকরণ। সুন্দরবন নদী-বাঁধ ও জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটির ব্যবস্থাপনায় অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, অল ইন্ডিয়া ইউকো ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্র্যাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এবং কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের পক্ষ থেকে ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়।

ব্যাঙ্ককর্মীদের ত্রাণ বিতরণ

সুন্দরবন নদীবাঁধ ও জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটির মুখপাত্র পবিত্র মাইতি জানান, নদী-বাঁধগুলির অবস্থা খুবই বিপজ্জনক। অবিলম্বে সরকার এদিকে দৃষ্টি না দিলে অবস্থার আরও অবনতি হবে। তাছাড়া সরকারি ত্রাণও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ব্যাঙ্ককর্মীদের পক্ষ থেকে ত্রাণ বণ্টন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ইউসুফ মোল্লা, মনোজ মণ্ডল, জয়দেব সরকার, অরূপ বর্মণ রায়, নীলকমল হালদার প্রমুখ।

কৃষ্ণনগর, নদিয়া

কৃষ্ণনগর ঃ কৃষ্ণনগর কোভিড কেয়ার ফোরাম প্রথম দিকে করোনা সংক্রমিতদের সাহায্য করেছে। লকডাউনের কারণে গরিবের ঘরে আর্থিক সংকট খুবই তীব্র হওয়ায় তাদের সাহায্য করতে প্রতিদিন ৩০-৩৫ জনের তালিকা করে ৩ কেজি চাল, ১ কেজি আটা, চারশো গ্রাম ডাল, এক প্যাকেট সয়াবিন, তেল, লবণ, সাবান, মাস্ক প্রভৃতি প্রায় তিনশো টাকার সামগ্রী তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রথম দিন রেলের হকার ও রিক্সা চালক, দ্বিতীয় দিন নাট্যদলে দিনমজুরি খাটা কর্মী, তৃতীয় দিন পরিচারিকা ও মিড-ডে মিল কর্মী, তারপর থেকে নানা অংশের গরিব পরিবারের হাতে সাহায্য তুলে দেওয়া হয়েছে। ৭-১৪ জুন এই আট দিনে মোট ২৫১ জনকে ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে কৃষ্ণনগরের অগণিত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সমস্ত দিক থেকে সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন।

কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

কর্মপ্রার্থী সমিতির ত্রাণ বন্টন

যুব কর্মপ্রার্থীদের উদ্যোগে ইয়াস ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করা হয়। 'পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতি'র পক্ষ থেকে ২০ জুন

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলী থানার অন্তর্গত দেউলবাড়ি-দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে চাল, ডাল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী সহ প্রায় ৩০০টি পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

কর্পোরেট স্বার্থে মধ্যপ্রদেশে জঙ্গল ধ্বংস করছে বিজেপি সরকার

মধ্যপ্রদেশের ছতরপুর জেলায় বক্সওয়াহা জঙ্গলের ৩৮০ হেক্টরেরও বেশি জমি ও ২ লক্ষের বেশি গাছ ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছে বিজেপি সরকার। আদিত্য বিড়লা গ্রুপের হিরে খনি প্রকল্পে এই বিরাট এলাকায় সমস্ত গাছ কাটার ছাড়পত্র দিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষের জীবন এবং সামগ্রিকভাবে পরিবেশ ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছে। এস ইউ সি আই (সি) মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল ১০ জুন এক বিবৃতিতে এই সর্বনাশা প্রকল্পের তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

তিনি বলেন, এই প্রকল্পে কর্মসংস্থানের খোয়াব দেখাচ্ছে বিজেপি সরকার। অথচ অফিসার, কর্মচারী, মজুর মিলিয়ে এই প্রকল্পে ৩০০ থেকে ৪০০-র বেশি কর্মসংস্থান অসম্ভব তা সরকারই বলছে। কিন্তু এর জন্য ২০টি গ্রামের ৮ হাজারের বেশি পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে। বহু আদিবাসী পরিবার যারা অরণ্য থেকে সংগৃহীত নানা জিনিস বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে তারা চরম সংকটে পড়বে। এছাড়াও হিরে শোধনের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক এলাকার জমি ও জলের মারাত্মক দূষণ ঘটাবে। কমরেড সামল উল্লেখ করেছেন, কিছুদিন আগে করোনার কারণে মধ্যপ্রদেশের সিহোরের রোজগার হারানো এক গরিব কৃষক একটিমাত্র গাছ কাটার ফলে বিজেপির রাজ্য সরকার তার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। আদালত তাকে এক কোটি টাকা জরিমানার শাস্তি দিতে গিয়ে বলেছে এই গাছ যে অক্সিজেন উৎপন্ন করে তা অমূল্য।

ভারতের শীর্ষ আদালত ২০১৯-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি এক রায়ে অরণ্যের ক্ষতি রুখবার কথা বলে যে রায় দিয়েছে তাতে ২০ লক্ষ আদিবাসী এবং প্রান্তিক বনবাসী পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে। অথচ পুঁজিপতি শ্রেণির লাভের প্রশ্ন এলে এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার রক্ষকরা উন্নয়নের ধুয়ো তুলে নির্বিচারে পরিবেশ ধ্বংসের পক্ষে সওয়াল করতে থাকে। গরিব মানুষকে তার ভিটেমাটি জীবন জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করতে রাষ্ট্র তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। এই অরণ্য রক্ষার জন্য পরিবেশ কর্মীরা ইতিমধ্যেই আন্দোলন শুরু করেছেন। এস ইউ সি আই (সি) দল অবিলম্বে এই প্রকল্প বাতিল করার দাবি জানিয়েছে।

এনআরসি-সিএএ ঃ বিক্ষোভ বেলদায়

এন আর সি বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে ১৮ জুন পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় বিক্ষোভ। কমিটি ১২-১৮ জুন বিজেপি সরকারের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করে।

ফি মকুবের দাবি ডিএসও-র

১৭ জুন সরকারি উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাসামগ্রী দেওয়া, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপের টাকা ফেরত এবং একাদশ শ্রেণি ও কলেজগুলিতে ফি সম্পূর্ণ মকুবের দাবিতে এ আই ডি এস ও পূর্ব মেদিনীপুরে জেলাশাসক দফতরে ডেপুটেশন দেয়।

ফালাকাটায় রক্তদান শিবির

আলিপুরদুয়ার জেলায় এআইডিএসও ফালাকাটা ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ১৫ জুন ফালাকাটা টাউন ক্লাবের ইনডোর স্টেডিয়ামে রক্তদান শিবির হয়।

আইনজীবীদের ত্রাণ বিতরণ

৯ জুন নামখানায় ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ বিতরণ করল আইনজীবীদের সংগঠন লিগাল সার্ভিস সেন্টার

কাজ হারানো, দুর্গত মানুষের পাশে এআইডিএসও

করোনা অতিমারিতে কাজ হারানো অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে এআইডিএসও এবং এআইএমএসএস-এর যৌথ উদ্যোগে খোলা হয়েছে বিনা পয়সার বাজার। এই বাজারে যারা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানানো হয় সংগঠনের মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে।

মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের ঘোষিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক ঃ এ আই ডি এস ও

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে এ আই ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক ১৯ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, পর্ষদের এই ঘোষণা ছাত্রছাত্রীদের মেধার যথার্থ বিচারের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করবে না এবং স্বভাবতই শিক্ষার্থীদের হতাশ করবে। পরবর্তী স্তরে শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচারে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করবে।

প্রথমত, যে কোনও ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানলাভের অগ্রগতির বর্তমান পরিস্থিতি নির্ধারণ যদি ২ বছর বা ৩ বছর আগের পড়াশুনার মানের ভিত্তিতে হয়, তাহলে তা হয় ছাত্রছাত্রীদের প্রতি একটি চূড়ান্ত অবিচার। অথচ পর্ষদের পক্ষ থেকে এই পদ্ধতিটিকেই অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটি একটি অবৈজ্ঞানিক ও অমানবিক পদক্ষেপ।

দ্বিতীয়ত, অসন্তুষ্ট পরীক্ষার্থীদের জন্য পরে অফলাইনে পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। যদিও এই সিদ্ধান্ত আমাদের সংগঠনের দেওয়া ‘পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করে ক্লাসরুম পরীক্ষার’ প্রস্তাবকে প্রকারান্তরে গ্রহণ করেছে, কিন্তু এমনভাবে গ্রহণ করা হল, যা ছাত্রছাত্রীদের মানসিক অবসাদের ও হতাশার দিকে ঠেলে দেবে। কারণ অফলাইন পরীক্ষা যারা দিতে চাইবে, তারা যখন দেওয়ার সুযোগ পাবে, তখন এই শিক্ষাবর্ষ চালু হয়ে যাবে এবং সেই শিক্ষাবর্ষে অফলাইন পরীক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারবে কিনা তার কোনও নিশ্চয়তানেই। ফলে কেউ পরীক্ষা দিতে চাইলে তার একটি শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বভাবতই শিক্ষাবর্ষ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা পর্ষদের বর্তমান মূল্যায়নকেই মেনে নিতে বাধ্য হবে। যা চূড়ান্ত অমানবিক।

আমরা সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছি, ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত সতর্কতার দায়িত্ব গ্রহণ করে সীমিত পরিসরে তারা ক্লাসরুম পরীক্ষা গ্রহণ করুক। আমরা আবারও দাবি করছি, সরকার এই দায়িত্ব অস্বীকার না করে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের প্রতি দায়িত্বশীল হয়ে তাদের বর্তমান প্রস্তুতির মূল্যায়ন করার উপযুক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করুক।

পাঠকের মতামত

কর্পোরেট হাউসের গুড বুকে সিপিএম

পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী দল হিসাবে কংগ্রেস, বিজেপি এবং আঞ্চলিক পুঁজির প্রতিনিধিত্বকারী ডিএমকে, অকালি, আরজেডি, বহুজন সমাজ পার্টি, তৃণমূল কংগ্রেস সহ ডজন ডজন আঞ্চলিক দল কর্পোরেট হাউসের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দল চালায় এবং নির্বাচনে লড়ে। এরা মালিক শ্রেণিরই স্বার্থরক্ষাকারী দল। কিন্তু সিপিএমকে কর্পোরেট হাউস টাকা দেবে কেন? নিশ্চয় পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে আপসহীন বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলে পুঁজিবাদের কবর খোঁড়ার জন্য তারা দেয়নি। এই দৌড়ে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসও সিপিএমের অনেকটা পিছনে। এবার কর্পোরেট হাউস সিপিএমকে দিয়েছে ১৯.৬ কোটি টাকা, তৃণমূল পেয়েছে ৮ কোটি টাকা (সূত্র ঃ বিজনেস টুডে-১০ জুন, ২০২১)। সিপিএম সত্যিই বামপন্থার চর্চা করলে কর্পোরেট হাউস তাদের নির্বাচনী ভেট দিত কি? তাই বামপন্থার ঝাণ্ডা ফেলে সুবিধামতো কখনও কংগ্রেসকে সেকুলার, কখনও সাম্প্রদায়িক আব্বাস সিদ্দিকির দলকে সেকুলার তকমা দিতে তাদের কোনও অসুবিধা হয় না। কর্পোরেট হাউসের কাছ থেকে অর্থ নিতে গদি ফিরে পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর সিপিএমের নৈতিক বিরোধ দেখা দেয়নি।

দেশের মধ্যে বড় বামপন্থী দল বলে পরিচিত সিপিএম। তথাকথিত নিরপেক্ষ প্রচারমাধ্যম সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের পরাজয়কে বামপন্থার পরাজয় হিসাবেই তুলে ধরছে। কিন্তু সিপিএমের জয়-পরাজয়ের সাথে বামপন্থার সম্পর্কটা কী?

বামপন্থী রাজনীতি মানে অত্যাচারিত মানুষের হয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠার আপসহীন লড়াই। বামপন্থী রাজনীতি সমাজের শোষিত শ্রেণির মানুষের স্বার্থে আপসহীন লড়াইয়ের রাজনীতি। বামপন্থী বলে পরিচিত দলগুলোর এই রাজনীতির চর্চাই একসময় জওহরলাল নেহরুর চোখে বাংলাকে দুঃস্বপ্নের নগরীতে পরিণত করেছিল। এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে টানা তিন মাস লড়াই, ১৯৫৪ এর শিক্ষক আন্দোলন, ১৯৫৬ এর বাংলা-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন, ১৯৫৯ ও ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন সহ ছাত্র-যুব-মহিলা-শ্রমিক-কৃষকদের বাঁচার লড়াই— সেদিন দেশের ছাত্র-যুব সমাজকে বিনা প্রতিবাদে অন্যায়কে না মানার, মাথা উঁচু করে চলার পথ দেখিয়েছিল। এই পথ ধরে এল ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার। কিন্তু সিপিএম সরকারে বসে নিজেরা আন্দোলনের রাস্তা পরিত্যাগ করল শুধু নয়, দক্ষিণপন্থীদের মতোই পুলিশকে দিয়ে লাঠি-গুলি চালিয়ে আন্দোলন ভেঙে দিতে শুরু করল, গুণ্ডা দিয়ে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের খুনের রাজনীতি শুরু করল। সে দিন থেকেই বামপন্থার পথ থেকে তারা সরে গিয়ে পুঁজিপতিদের কৃপাপ্রার্থী হতে শুরু করেছে। তাই ১৯৭৭ সাল থেকে টানা ৩৪ বছরের শাসনের শেষের দিকে সিঙ্গুরে বহুফসলি জমিতে টাটার গাড়ি কারখানার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের প্রতিবাদ যখন তুঙ্গে, তখন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন— টাটার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে দেব না। বাস্তবে করেও দেখিয়েছে সিপিএম। বিশ্বের কোনও দেশের গণআন্দোলন ভাঙতে এর আগে যা কেউ দেখেনি। বহুজাতিক সালেম গোষ্ঠীর সেজ বিরোধী গণআন্দোলন দমন করতে নন্দীগ্রামে দলের আশ্রিত কুখ্যাত গুণ্ডাদের পুলিশের পোশাক পরিয়ে গণহত্যা ও গণধর্ষণের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। এগুলো কি বামপন্থা? এর দ্বারা কি বামপন্থাকে কালিমালিপ্ত করা হয়নি?

শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির অন্য দলগুলির সাথে সিপিএমের নীতিগত কোনও ফারাক আছে কি? তাই সিপিএম হারলে বামপন্থার পরাজয় হয় না। বরং তাতে প্রকৃত বামপন্থী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি হওয়ার রাস্তা আরও পরিষ্কার হয়।

দেবব্রত বিশ্বাস, বর্ধমান

কিছু জরুরি পদক্ষেপ নিলে পরীক্ষা নেওয়া যেত

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের অন্যতম বড় পরীক্ষা । রাজ্য সরকার দীর্ঘ টালবাহানার পর ঘোষণা করেছে করোনা মহামারিতে এবারে পরীক্ষা হবে না। কিন্তু যে সমস্ত পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল তাদের কী হবে? পরীক্ষার মাধ্যমেই একজন ছাত্র ছাত্রীর যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব । মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে স্কুলগুলো নির্ধারণ করে উক্ত ছাত্র-ছাত্রী পরবর্তী ক্লাসে কি বিষয় নিয়ে পড়বে বিজ্ঞান ,কলা না বাণিজ্য । পরীক্ষা ছাড়া অন্যকোন পদ্ধতিতে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয় । ঠিক একইভাবে উচ্চমাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের উপর ভিত্তি করে স্নাতক স্তরে অনার্স পড়ার বিষয় নির্ভর করে।

মহামারি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে, বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিয়ে, সমস্ত শিক্ষক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, ও ডাক্তারদের পরামর্শের ভিত্তিতে কী উপায়ে পরীক্ষা পরিচালনা করা যায়, তা ঠিক করা কি যেত না? করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের আগে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ভ্যাকসিন দেওয়া হলে তাদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যেত। পরীক্ষানেওয়ারক্ষেত্রে আরও একধাপ এগোতে পারত সরকার। করোনা মহামারির এই সংক্রমণের মুহূর্তে পরীক্ষার সিলেবাস সংকুচিত করে একই দিনে বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করে পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারত। কোনও কারণে সংক্রমণ বৃদ্ধি পেলে হোমঅ্যাসাইনমেন্ট, টেলি কলিং ভাইভার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারত। ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের হোমসেন্টারগুলিতে পরীক্ষানেওয়ার ব্যবস্থা করাযেত। পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য ভিন্ন স্কুলের শিক্ষক এমনকি পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপারে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদেরও কাজে লাগানো যেত। সরকারিভাবে পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিকে স্যানিটাইজেশন এবং পরীক্ষার্থীদের মাস্ক, স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভসের ব্যবস্থা করাযেত। পরীক্ষার দিনগুলোতে যথাযথ পরিবহণের ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে করা যেতে পারত। পরীক্ষার দিনসেন্টারগুলোতে অযথা ভিড় প্রতিরোধে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেত। এই বিকল্প ভাবনা গুলোর মাধ্যমে পরীক্ষানেওয়া হলে ছাত্রদের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হত। কিন্তু সরকার তা করল না। এগুলি করা অসম্ভবও ছিল না। গভীর পরিতাপের বিষয় আমরাদেখলাম রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার বিষয়ে ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক অভিভাবক, বিভিন্ন সংগঠনের মতামত একদিনের মধ্যে ইমেল মারফত জানাবার কথা বলেছিল। যেখানে মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকমোট পরীক্ষার্থী কুড়ি লক্ষেরও বেশি, সেখানে মাত্র ৩৪ হাজার মতামত এসেছে। একে কি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত হিসাবে মেনেনেওয়া যায়? আসলে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলযে পরীক্ষা নেবে না, মতামত নেওয়াটা জনগণেরচোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া আর কিছুই না। ইতিমধ্যে পরীক্ষা না হওয়ার মানসিক যন্ত্রণায় এক ছাত্রী আত্মহত্যার পথবেছে নিয়েছে। এই মৃত্যুর দায় কি এড়াতে পারে সরকার?

শ্যামল দত্ত, উত্তর দিনাজপুর

ত্রাণের ভিক্ষাবৃত্তি নয়, চাই সমাধান ঃ দাবি সুন্দরবনের মানুষের

লঞ্চের ইঞ্জিনের আওয়াজ পেলেই দৌড়ে এসে একেবারে বুকজল পর্যন্ত নেমে কাতর আবেদন জানাচ্ছেন একদল মানুষ। শিশুকোলে মা থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত সামিল সেই দলে। লঞ্চ কোনও গ্রামের কাছাকাছি এলেই একই দৃশ্যের অবতারণা হচ্ছে বারবার। এমনই দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছে গোসাবা হয়ে সুন্দরবন এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ত্রাণ নিয়ে যাওয়া বহু স্বেচ্ছাসেবীকে। কত অসহায় হলে তবে সামান্য কিছু ত্রাণের জন্য শয়ে শয়ে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এমন কাতর আবেদন জানায়!

গোসাবা ব্লকের রানিপুর গ্রামে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে যাওয়া স্বেচ্ছাসেবী দলের সাথে পৌঁছে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা এককথায় মর্মস্পর্শী। ইয়াস ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস হয়ে গেছে ২৬ মে, তার প্রায় একুশ দিন পার করেও গ্রামের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছে হাহাকার। কারও ঘরবাড়ি সব গেছে, কারও পুকুরে লাগানো সামান্য পুঁজিটুকু নোনাজলে শেষ। মাছ ধরার জাল নৌকা সব কিছুর ক্ষতি হয়েছে জলোচ্ছ্বাসে। আবার কারও বা ঘরে মেয়েদের-শিশুদের পরার পর্যাপ্ত পোষাক নেই। হাজার হাজার বিঘা জমি নোনা জলের তলায়।

ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যাঁরা, মুখে বিষণ্ণতার সাথে মিশে আছে লজ্জার জড়তা। যে হাত অভ্যস্ত চাষ করতে, মাছ ধরতে, নিজের রুটিরুজি নিজে খেটে অর্জন করতে সেই হাতগুলো পাততে হয়েছে সামান্য সাহায্যের জন্য! লজ্জার গভীরতা বোঝা যায় ত্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরতে ফিরতে ডুকরে কেঁদে ওঠা এক গ্রাম্য বধূকে দেখে। কথা বলতে এগিয়ে যেতে থামলেন, বুক ঠেলে ওঠা কষ্টটাকে গিলে নিয়ে বললেন, 'বলতে পারেন আর কতকাল এমন করে বারে বারে সব হারাতে হবে? জানেন, একটা সংসারকে গড়ে তুলতে কত মেহনত লাগে? আর সে সব যখন ভেসে যায়, শুধু জিনিসের দাম ধরে তার হিসাব করতে পারবেন?' এরপর যা বললেন, তা আজ সারা সুন্দরবনের মনের কথা— 'বছর বছর ত্রাণের দয়া নয়, আমাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই। দাঁড়াবেন আমাদের পাশে? কলকাতা শহরে ফিরে বলবেন আমাদের কথা? সরকারি কর্তাদের জানাবেন, আমরা দাক্ষিণ্যে আর ভুলব না, সমাধান আদায় করব।' কী নাম বললেন, কান্নার বেগ এসে তা অস্পষ্ট করে দিল। ভাবলাম নাম নিয়েই বা কী হবে? এমন গাঁয়ের মা-বোনের সংখ্যা তো কম নয়! তাঁরা অনেকেই দাঁড়িয়েছিলেন ঘিরে, জানিয়ে দিয়েছেন এটাই তাঁদের মনের কথা।

চেন্নাইয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে যাওয়া প্রশান্ত পয়ড়্যা, গত বছর লকডাউনের সময় থেকেই ঘরে। কাজ খুঁজে খুঁজে হয়রান। পুকুরে মাছ চাষ আর কিছু জমির ফসলের জোরে কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে নিচ্ছিলেন। এবারে সেটুকুও খুইয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় তাঁর নামে ঘর অনুমোদন হয়েছিল বছরখানেক আগে। কিন্তু পঞ্চায়েতবাবুদের কাটমানি দেওয়ার পর হাতে যা আছে তাতে দেওয়ালের অর্ধেকটা উঠেছে। এবারের দুর্যোগে পুরনো বেড়া, টিন আর মাটির ঘরটারও ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। এই বর্ষা কী করে কাটাবেন, ভেবে উঠতে পারছেন না। দুর্যোগের চিহ্ন গায়ে মেখেই জলকাদার ফোয়ারা তুলেশৈশবের আনন্দে খেলে বেড়াচ্ছে একদন ছেলেমেয়ে। তাদের দেখিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, প্রতাপ কুইল্যা, 'ওরা যে কী হারালো তা বোঝার বয়স ওদের হয়নি। একবছরের বেশি স্কুল বন্ধ, এই এলাকায় অনলাইন পড়াশোনার কোনও প্রশ্নই নেই। সরকারের কোনও মাথাব্যথা আছে বলে মনেও হয় না! গরিব ঘরে যতটুকু শিক্ষার সুযোগ পেত তাও শেষ! লকডাউন উঠলে এদের অনেকেই হয়ত বাপ-কাকার হাত ধরে পরিযায়ী শিশুশ্রমিকের দলে নাম লেখাবে!'

ফিরতি পথে লঞ্চ একটু এগোতেই পাড় থেকে ভেসে এল সমবেত একটা চিৎকার— 'ওগো, আমাদেরও কিছু দিয়ে যাও বাবু'। কিছুই যে দেওয়ার মতো আর অশিষ্ট নেই! কিন্তু দু'ঘন্টার জলযাত্রার প্রায় পুরোটাতেই দুই পাড়েই নানা জায়গায় প্লাবিত গ্রামের পাড় ধরে ম্যানগ্রোভ বন ঠেলে ছুটে আসছে দলকে দল মানুষ। কেউ চাইছেন একটু পানীয় জল, কেউ চাইছেন বাচ্চাদের খাবার। ওই এলাকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুমন জানারও তখন দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। প্রশ্ন করলাম, 'কী এর সমাধান?' হাতাশ চোখে পাড়ের দিকে তাকিয়ে মাস্টারমশাই বলে চললেন, 'সমাধান আছে, ম্যানগ্রোভ গাছের

সাতের পাতায় দেখুন

আশা: নিরাশায় ডুবে থাকা নিরলস কর্মীবাহিনী

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫৫ হাজার আশাকর্মী রয়েছেন। গ্রামবাংলার তৃণমূল স্তরের জনস্বাস্থ্যের ভার এঁদের ওপর। কার জ্বর হয়েছে, কোন মায়ের কী অবস্থা, কে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত, শিশুদের আয়রন খাওয়ানো, টিকার ব্যবস্থা করা, গর্ভবতী মহিলাদের দিনে রাতে যখনই দরকার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, সুগার, প্রেশার, হার্টের রোগী শনাক্ত করা, টিবি রোগীকে ওষুধ খাওয়ানো ইত্যাদি নানা পরিষেবা দিয়ে চলেছেন আশাকর্মীরা। গত বছর থেকে বাড়তি যুক্ত হয়েছে করোনা চিকিৎসার দায়িত্ব। প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্ভে করা, কারও জ্বর হলে করোনা টেস্টের ব্যবস্থা করা, করোনা পজিটিভ হলে ওষুধ বাড়ি পৌঁছে দেওয়া, প্রতিদিন অক্সিজেন মাপা, ভ্যাকসিনের জন্য তালিকা প্রস্তুত করা এবং সমস্ত রিপোর্ট প্রতিদিন সেন্টারে গিয়ে জমা দেওয়া। এক কথায় স্বাস্থ্য পরিষেবার বিরাট দায়িত্ব এঁদের উপর। তবুও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এঁদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দিচ্ছে না।

পুরুলিয়ার বান্দোয়ান সেন্টারের আশাকর্মী দ্রৌপদী মাহাতো। নিজে সুগারের রোগী, এইসব কাজ করতে করতেই একদিন জ্বরে পড়লেন। এর মধ্যেও কাজ করে যেতে হয়েছে। ছ'দিন পর খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। শয্যাশায়ী অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করার চার দিনের মাথায় শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হয় তাঁর। বাড়িতে দুই নাবালক সন্তান। তাঁর স্বামীর প্রশ্ন, 'সরকারি কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে কি'? কিন্তু বৃথা তাঁর আবেদন, কারণ, কর্মরত অবস্থায় আশাকর্মীর মৃত্যু হলে তার পরিবারের জন্য সরকারের কোনও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই।

হাওড়া জেলার আশাকর্মী রেহানা কাজি। ব্রেন স্ট্রোক হয় তাঁর। দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরেও সরকার পাশে থাকেনি। চিকিৎসা চলাকালীন অসুস্থতার জন্য কাজ করতে পারেননি বলে তাঁর সাম্মানিক ভাতাটুকুও বন্ধকরে দেওয়া হয়। এরপর বলা হয় কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা। রেহানা একা নন। এরকম অনেক রেহানা দিনের পর দিন চরম সরকারি বঞ্চনা সহ্য করে চলেছেন।

মাসে মাত্র ২০০০ টাকা বেতন দিয়ে হাসপাতালে 'দিশা' ডিউটি চালু করেছে রাজ্য সরকার। আশাকর্মীদের বাধ্যতামূলক একমাস ব্লক হাসপাতালে কাজ করতে হয়। সদ্যোজাত শিশু ও মায়েদের পরিষেবা দেওয়া, হাসপাতালে নার্সদের ফাইফরমাশ খাটা- এই রকম সব কাজ করতে হয়। আট ঘণ্টা ডিউটি, লকডাউনে যানবাহন বন্ধ। হৃদরোগী হয়েও গত বছর লকডাউনে ৫২ বছর বয়সী ঝালদার এক আশাকর্মীকে প্রতিদিন ২২-২৩ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে হাসপাতালে ডিউটি করতে যেতে আসতে হয়েছে। এক বছর আগে পুরুলিয়ার কোটশিলা ব্লকের আশাকর্মী সুভদ্রা মাহাতো হাসপাতালে ডিউটি করতে আসার পথে দুর্ঘটনায় মারা যান। উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রী তাঁর ১৮ বছরের মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে আশাকর্মী ইউনিয়নের এক সংগঠককে বলেছিল "মাসি, মায়ের উপার্জনের টাকাতেই আমাদের পরিবার চলত। আমার আর ছোট ভাইয়ের পড়াশোনাও চলত ওই টাকাতেই। এখন কী করে চলবে? যদি মায়ের চাকরিটা পাওয়া যায় একটু দেখো।" বোকা মেয়ে জানত না, দায়িত্ব অস্বীকার করার জন্য নিয়োগের সময়ই আশাকর্মীদের 'ভলান্টিয়ার' করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। চাকরি তো দূরের কথা, মৃত্যুকালীন ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত এক পয়সাও নেই।

কর্মরত অবস্থায় এরকমভাবে পশ্চিমবঙ্গের বহু আশাকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য দপ্তরে বারবার প্রত্যেকটা ডেপুটেশনে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর জন্য পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি তোলা হয়, কিন্তু কি কেন্দ্র কি রাজ্য, কোন সরকারই কর্ণপাত করে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের এনআরএইচএম-এর অন্তর্গত আশা প্রকল্প চালু হয় ২০০৫ সালে কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন প্রথম ইউপিএ সরকারের আমলে। প্রসূতি ও শিশুর মৃত্যুতে ভারত তখন বিশ্বে প্রথম সারিতে। গ্রামীণ ভারতের বেশিরভাগ মা তখনও বাড়িতেই শিশুর জন্ম দিতেন। মা ও শিশুকে হাসপাতালমুখী করা, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ২০০৫ সাল থেকে ধাপে ধাপে ২০১১ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ব্লকে আশাকর্মী নিয়োগ করা হয়। রাজ্যে এখন প্রতি ১২০০ জনে একজন, সবমিলিয়ে ৫৪,৮৪৮ জন আশাকর্মী কাজ করেন। এঁরা সকলেই গ্রামাঞ্চলের অভাবী সংসারের মেয়ে বউ, অনেকেই বিধবা। অনেকের পরিবারেই আশাকর্মীরাই একমাত্র রোজগেরে সদস্য। শুরুতে মা ও শিশুদের নিয়ে ৫-৬ ধরনের কাজ করতে হত। সাম্মানিক ভাতা ছিল ৮০০ টাকা, দৈনিক ভাতা মাত্র ২৬ টাকা। নিয়োগের সময় থেকেই আশাদের 'স্বেচ্ছাসেবিকা' আখ্যা দিয়ে শ্রমিকদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কেন্দ্রের সরকার। সিপিএম পরিচালিত তৎকালীন রাজ্য সরকারও সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে।

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার স্থায়ী কাজের বদলে প্রকল্পভিত্তিক কাজ শুরু করে। এই প্রকল্পভিত্তিক কর্মচারীদের একেবারে নামমাত্র সাম্মানিক ভাতা দিয়ে ওই সংক্রান্ত সরকারি সমস্ত কাজ তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া শুরু হয়। ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশনের অন্তর্গত আশাও এই ধরনের একটা প্রকল্প। এই আশাকর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনশন, মেডিকেল ভাতা, ছুটি, মেডিকেল ছুটি, ইএসআই কোনকিছুই নেই। 'নো ওয়ার্ক নো পে' নিয়মে কাজ করতে হয়।

২০১১ সালে আশাকর্মীদের জন্য চালু হয় ফরম্যাট সিস্টেম। এই ফরম্যাটে ৪২ ধরনের পরিষেবার কাজ করতে বলা হয়। এর মধ্যে আছে মা ও শিশুর পরিষেবা সংক্রান্ত ২৬ রকমের কাজ ছাড়াও যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, প্রেশার, সুগার, হার্টের রোগ ইত্যাদি ১৬ রকমের কাজ। এ ছাড়াও রয়েছে পালস পোলিও, ফাইলেরিয়া, ব্লক হাসপাতালে ডিউটি, ভোটের ডিউটি, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ডিউটি, সরকারি মেলায় ডিউটি, দুয়ারে সরকারের ডিউটি, কোভিড সংক্রান্ত নানা ডিউটি। এছাড়াও হঠাৎ হঠাৎ বিএমওএইচ বা বিডিও অফিস থেকে তাঁদের বিভিন্ন কাজ করার জন্য বলা হয়। না করলেই জবাবদিহি করতে হয়। অথচ এই বাড়তি সরকারি কাজের জন্য আশাকর্মী কোনও পারিশ্রমিক পান না। উপরন্তু এই সমস্ত কাজের জন্য নিজস্ব ফরম্যাটের কাজ করতে না পারলে ফরম্যাটের টাকা কাটা যায়। না পারলে কিংবা প্রশ্ন করলেই আধিকারিকরা কাজ চলে যাওয়ার হুমকি দেন।

এত ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আশাকর্মীদের পারিশ্রমিক মাসে ছয় সাত হাজার টাকার বেশি হয় না। তার প্রধান কারণ, ফরম্যাট সিস্টেমে এমন কিছু নিয়ম আছে যার ফলে আশাকর্মীদের কাজের ফলাফল ১০০ শতাংশ নিশ্চিত না হলে ফরম্যাটের টাকা দেওয়া হয় না। নানা ধরনের সার্ভে লিস্ট আশাদের তিনটে রেজিস্টারে প্রতিদিন নথিভুক্ত করতে হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত রোগী পরিষেবা পেয়ে ১০০ ভাগ সুস্থ না হচ্ছে, ততক্ষণ আশাকর্মী কোনও টাকা পান না। মা ও শিশুর পরিষেবার কাজগুলি নির্দিষ্ট দিনে করতে হয়। কোনও কারণে ওই নির্দিষ্ট দিনে না করতে পারলে অথবা সাতটার মধ্যে একটা টিকা না দিতে পারলে বাকি টাকা কাটা যায়। প্রসবের পর নতুন মা বাপের বাড়ি চলে গেলে আশার কাজ সম্পূর্ণ হয় না। কাটা যায় মায়ের পরিষেবার সমস্ত টাকা। এ যেন সেই দাসযুগের দাসশ্রমিকের দশা, বিশ্বের 'বৃহত্তম গণতন্ত্রে'র দেশে!

কোভিড চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করতে হলেও আশাকর্মীদের জন্য সরকার কোনও সুরক্ষার ব্যবস্থা করেনি। এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের এক হাজারের বেশি আশাকর্মী কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। গত বছর এই কাজের জন্য কেন্দ্র মাসে ১০০০ টাকা বরাদ্দ করেছিল। ছ মাস পর বন্ধ করে দেয়। রাজ্য সরকার গত বছর করোনা পজিটিভ স্বাস্থ্যকর্মীদের এক লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত এ টাকা অধিকাংশ আশাকর্মীই পাননি।

২০১৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার এলে তাদের কাছেও বারবার আশাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আশাকর্মীদের সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানানো হয়, কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি। ২০১৯-এর ২৮ জানুয়ারি সারা ভারতবর্ষের আশাকর্মীরা দিল্লি অভিযান করেন। তার পাঁচদিন পর বাজেটে আশাকর্মীদের জন্য বেতন দ্বিগুণ করা ও পেনশন প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়। বলা হয় ওই বছর মার্চ মাস থেকে অনলাইনে পেনশন প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা কার্যকর করা হয়নি।

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তন হয়ে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর থেকে আরও কাজের বোঝা বেড়ে যায় আশাকর্মীদের। ২০১৭ সালের ১৭ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের নেতৃত্বে প্রায় ৪০ হাজার আশাকর্মী কলকাতার ধর্মতলার রানী রাসমণি রোডে বিক্ষোভ দেখান। এই বিক্ষোভ দমন করার জন্য পরদিনই স্বাস্থ্য দপ্তর আশাকর্মীদের এবং সমস্ত আশা আধিকারিকদের অগণতান্ত্রিকভাবে শোকজ করে। আধিকারিকরা আশাকর্মীদের নানারকম হয়রানি করে এবং ভয় দেখাতে থাকে, কিন্তু আশাকর্মীরা— যাঁদের জীবনে বঞ্চনা ছাড়া প্রাপ্তি কিছু নেই, অদম্য মনোবলে আন্দোলন চালাতে থাকে। বাধ্য হয়ে রাজ্য সরকার ২০১৮-১৯ সালে আশাদের সাম্মানিক ভাতা দুই ধাপে দেড় হাজার টাকা বাড়ায়।

বাড়তি কাজের চাপে আশাদের এমনিতেই হিমশিম অবস্থা, তার উপর গত বছর থেকে করোনা অতিমারির বিপুল কাজের ভার আশাকর্মীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় কোনরকম সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই। আশাকর্মীদের বিক্ষোভের আগুন আবার জ্বলে ওঠে। শুরু হয় ধর্মঘট, কর্মবিরতি, জেলায় জেলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন। রাজ্য সরকার আশাকর্মীদের কিছু কিছু দাবি মেনে নেয়। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে বোনাস ২০০০ টাকা, অবসর ভাতা তিন লক্ষ টাকা এবং সাম্মানিক ভাতা ১০০০ টাকা বাড়ানো হয়। কিন্তু সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতির মূল দাবি সরকার আজও মানছে না। এই অবস্থায় আন্দোলন তীব্রতর করা ছাড়া আশাকর্মীদের কোনও উপায় নেই।

স্থায়ী সমাধান দাবি সুন্দরবনের মানুষের

ছয়ের পাতার পর

নিবিড় বাঁধ, আর তার অন্তত দুশো-তিনশো মিটার পিছনে স্থায়ী কংক্রিটের বাঁধ দিতে পারলে বারবার এমন ভাঙন হয় না।' এর সাথে দরকার নবীন দ্বীপগুলি থেকে মানুষের বসতি তুলে তাদের সঠিক পুনর্বাসন দেওয়া। কিন্তু বিপুল খরচ, এই সব মানুষের জন্য সরকার কি এত করবে?' প্রশ্ন জাগছিল, কেন করবে না? লঞ্চের সারেঙ বলে উঠলেন, 'কেন করবে না বলুন তো? বড়লোকেদের কতটাকা ছাড় দেয় সরকার! গরিবের জন্য এটুকু দেবে না? আর এই কাজ তো শুধু এইকটা গ্রামের কাজে লাগবে না, সারা রাজ্যের মঙ্গল হবে, ঝড় ঝঞ্ঝা আটকাবে অনেকটা, আপনারাই তো বলেন!' নিরুত্তর মাসাটারমশাই গভীর ব্যথায় ডুবে গেছেন চিন্তায়। জলে অধডোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি মুখ ভেসে ভেসে সরে যাচ্ছে পিছনে। কিন্তু আসলে সরছে না, ছাপ ফেলে যাচ্ছে বিবেকের দরবারে— এ দাবি আদায়ের লড়াইতে কি পাশে থাকবে না তোমরা! উপস্থিত সকলের বিবেক অস্ফুট স্বরে কথা দিয়ে এল— থাকব। সুন্দরবনের নোনা বাদার মানুষের বাঁচার এ লড়াই জেতার দায় আজ আমাদেরও, দায় সারা বাংলার বিবেকবান মানুষের।

সেন্ট্রাল ভিস্টা ঃ মৃতদেহের স্তূপের ওপর দম্ভ-সৌধ নির্মাণ করতে চান নরেন্দ্র মোদি

দেশ আজ কোভিড অতিমারিতে বিপন্ন। মৃত্যু হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষের। ওষুধ, ভ্যাকসিন, ভেন্টিলেটর, বেডের হাহাকার চতুর্দিকে। অক্সিজেনের অভাবেই যে কত মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন, তার হিসেব নেই। শ্মশানেও লম্বা লাইন। গঙ্গায় শবদেহ ভেসে যাচ্ছে, কুকুরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মৃতদেহ। কোনও সংবেদনশীল মানুষ কি এ দৃশ্য সহ্য করতে পারে! কিন্তু আমাদের লৌহকঠিন-হৃদয় প্রধানমন্ত্রী এই বীভৎসতা শুধু অগ্রাহ্য করে চলেছেন তাই নয়, এই ভয়ানক সময়ে তিনি পূর্ণ উদ্যমে লেগে পড়েছেন তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প 'সেন্ট্রাল ভিস্টা'-কে রূপ দিতে।

কী এই সেন্ট্রাল ভিস্টা প্রকল্প? দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ইন্ডিয়া গেট— এই দীর্ঘ রাজপথের দু'ধারে যে সরকারি ভবনগুলো রয়েছে, ২০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে সেগুলি ভেঙে তৈরি হবে একাধিক বিলাসবহুল প্রাসাদ। তৈরি হবে নতুন সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রী ও উপরাষ্ট্রপতির প্রাসাদোপম বাসভবন। থাকবে বিশেষ রক্ষীবাহিনীর থাকার ব্যবস্থা। এখানে ৫৯ টি মন্ত্রককে একত্রিত করে, আমলাদের একসাথে রেখে দেশে বোধহয় আরও জোরদার সুশাসনই কায়েম করতে চান মোদিজি!

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বলছে, বিশ্বমানের এই সেন্ট্রাল ভিস্টা নাকি দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছরের জাতীয় গৌরব ফলকে পরিণত হবে। ২০২২ সালের ২৬ জানুয়ারি এই নবনির্মিত প্রাসাদেই স্বাধীনতার ৭৫ বছরের প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপিত হবে। তাই অতিমারির হাত থেকে মানুষের প্রাণ বাঁচাতে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বদলে বিপুল টাকা খরচ করে অতি দ্রুততার সাথে চলছে প্রাসাদ নির্মাণের কাজ। এটি নাকি 'অত্যাবশ্যকীয় প্রকল্প'। ফলে দিল্লির লকডাউনেও কুছ পরওয়া নেহি। সংক্রমণের তোয়াক্কা না করে সেখানে ১৮০টি গাড়ি চলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কয়েক হাজার শ্রমিককে নিয়ে জোরকদমে চলছে কাজ। এতে দিল্লিতে সংক্রমণের হার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দিল্লি হাইকোর্টে অভিযোগ জানিয়েছিলেন ইতিহাসবিদ সোহেল হাশমি সহ কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক। কিন্তু আদালত মোদিজির সহায়। ফলে অপ্রতিরোধ্য মোদি এগিয়ে চলেছেন তাঁর 'দম্ভ-সৌধ' নির্মাণে।

জানা গেছে, সেন্ট্রাল ভিস্টা গড়তে ঐতিহ্যমন্ডিত নানা সরকারি ভবন— যেমন উদ্যোগ, কৃষি, বায়ু, রেল, নির্মাণ, শাস্ত্রী ভবন, এমনকি বিখ্যাত বিজ্ঞানভবন, ঐতিহাসিক জাতীয় সংরক্ষণাগার 'ন্যাশনাল আর্কাইভস' এবং প্রাসাদতুল্য জওহরলাল নেহেরু ভবন ভেঙে ফেলা হবে। কেটে ফেলা হবে সুপ্রাচীন বিশাল গাছগুলি। সেন্ট্রাল ভিস্টা গড়তে গিয়ে জাতীয় জাদুঘরের প্রায় দুই লক্ষেরও বেশি দুর্মূল্য বস্তুর সংরক্ষণ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার এবং গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, নোবেলজয়ী ওরহান পামুকের মতো শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিকেরা এই ক্ষতিকর প্রকল্প বন্ধের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু ফ্যাসিস্ট শাসকদের মতো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এইসব আপত্তিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন।

প্রশ্ন উঠছে, দিল্লির সবচেয়ে মূল্যবান ১২ একর জমির উপর পাঁচটি বাংলো জুড়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থাকা সত্ত্বেও মোদিজি অতিমারিতে সংকটাপন্ন মানুষকে বাঁচানোর পরিবর্তে বিশ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পের কাজে এত তৎপরকেন? অনেকে বলছেন, এ হল যে কোনও উপায়ে নিজের নাম ইতিহাসের বুকে খোদাই করে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। সে কীর্তিসৌধ দেশবাসীর মৃতদেহের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও আপত্তি নেই বিজেপি সরকারের। বিদ্বজ্জনদের একাংশের মতে, মোগল ও ব্রিটিশ যুগের যে স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে দিল্লিকে ঘিরে, তা মুছে দিতে চান মোদি ও তাঁর দল। এর পিছনে রয়েছে আরএসএস-এর হিন্দুত্ববাদী পরিকল্পনা।

মোদি সরকারের এই নির্মম কার্যকলাপে স্তম্ভিত দেশের মানুষ ধিক্কার জানাচ্ছে। তাঁরা চাইছেন, এই কঠিন সময়ে বিপুল অর্থ অপ্রয়োজনীয় সৌধ নির্মাণে অপচয় না করে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে অতিমারি মোকাবিলায় মানুষের পাশে দাঁড়াক।

মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন পরিচারিকা সমিতির

করোনা সংক্রমণ ও লকডাউনের জন্য কাজে যোগ দিতে পারছেন না গৃহ পরিচারিকাদের অনেকে। অনেককে কাজে আসতে বারণও করা হচ্ছে। আবার এর মধ্যে বাড়ি বাড়ি কাজ করতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন কেউ কেউ।

প্রথম দফার করোনা অতিমারিতে পরিচারিকাদের অনেকের কাজ চলে গিয়েছিল। দ্বিতীয় দফায়ও অনেকে বিশেষ করে ট্রেন যাত্রী পরিচারিকারা কাজ হারিয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে ২২ মে সভানেত্রী লিলি পাল ও সম্পাদিকা পার্বতী পাল মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেন। তাঁদের দাবি, পরিচারিকা সহ সমস্ত অসংগঠিত কর্মহীন শ্রমিক পরিবারকে মাসিক ৭৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দিতে হবে, রেশন কার্ড না থাকলেও রেশনের মাধ্যমে এই পরিবারগুলির প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি মাসে ১০ কেজি করে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করতে হবে, অবিলম্বে বিনামূল্যে সবার জন্য করোনা ভ্যাক্সিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্যারি কমিউন

তিনের পাতার পর

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ব্যয় বহন করতে হল কৃষকদেরই। মার্ক্স লিখলেন, "সেই মুহূর্ত থেকে ফরাসি কৃষকের কাছে প্রজাতন্ত্রের অর্থ হল ৪৫ সাঁতিমের ট্যাক্স, প্যারিস প্রলেতারিয়েত তার চোখে প্রতিভাত হল এমন এক উচ্ছৃঙ্খল গোষ্ঠী বলে যে তার ঘাড় ভেঙে নিজেরটা গুছিয়ে নিচ্ছে।"

"১৭৮৯ এর বিপ্লব যেখানে শুরু হয়েছিল কৃষকদের ঘাড় থেকে সামন্তী বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, সেখানে ১৮৪৮ এর বিপ্লব গ্রামীণ জনতার কাছে আত্মঘোষণা জানাল নতুন কর বসিয়ে এবং তা এই জন্য যাতে পুঁজি বিপন্ন না হয় এবং তার পাহারাদার হিসাবে রাষ্ট্রযন্ত্র চালু থাকতে পারে।"

পেটিবুর্জোয়ারাও তাদের সমস্ত দুরবস্থার জন্য ন্যাশনাল ওয়ার্কশপগুলিকেই দায়ী করল। প্রবল ক্রোধ নিয়ে হিসেব কষতে বসল, যখন তারা নিজেরা অসহ্য দুরবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে তখন 'নিষ্কর্মা' শ্রমিকরা সরকারি অর্থ কী পরিমাণে গ্রাস করছে।

এ দিকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সাথে সাথে প্রলেতারিয়েতকে যে সব সুবিধা দিতে হয়েছিল, যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বুর্জোয়াদের কাছে সেগুলি এখন পরিণত হল শৃঙ্খলে, যা না খসালেই নয়। এমনকি একটা কথার কথা হিসাবেও শ্রমিকদের মুক্তি নতুন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে হয়ে উঠল অসহ্যরকমের মারাত্মক। কারণ চালু আর্থিক শ্রেণি-সম্পর্কের অবিচল ও নির্বিঘ্ন স্বীকৃতির উপরে যার নির্ভর সেই ক্রেডিট ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে এ দাবি এক স্থায়ী প্রতিবাদ। অতএব প্রয়োজন হয়ে পড়ল শ্রমিকের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেওয়ার।

এই রকম পরিস্থিতিতে, ৪ মে সংবিধান পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। নির্বাচনে বুর্জোয়াদের জয়জয়কার। নির্বাচকরা শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রত্যাখ্যান করল। নবনির্বাচিত জাতীয় সংবিধান কক্ষ পরিণত হল প্যারির প্রলেতারিয়েতের বিচারসভায়। শ্রমিকদের যে সব সুবিধাগুলি দেওয়া হয়েছিল সবই কেড়ে নেওয়া হল। এক্সিকিউটিভ কমিশন থেকে প্রলেতারিয়েত প্রতিনিধি লুই ব্লাঁ ও আলবেরকে সরাসরি বাদ দেওয়া হল। সেই অর্থে প্রজাতন্ত্রের সূচনা ৪ মে থেকে, ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে নয়। মার্ক্স লিখেছেন, "প্যারিস প্রলেতারিয়েত অস্থায়ী সরকারের উপর যে প্রজাতন্ত্র চাপিয়ে দিয়েছিল, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সহ প্রজাতন্ত্র, ব্যারিকেড-সংগ্রামীদের দৃষ্টিতে ছিল যে ধ্যানমূর্তি— এ সেই প্রজাতন্ত্র নয়। জাতীয় পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত একমাত্র বৈধ প্রজাতন্ত্রটি এমন এক প্রজাতন্ত্র যা বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরোধী কোনও বিপ্লবী হাতিয়ার নয়, বরং এই ব্যবস্থারই রাজনৈতিক পুনর্গঠন, বুর্জোয়া সমাজের রাজনৈতিক পুনর্সংহতি, এক কথায় একটি বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র।"

নতুন সরকারের মন্ত্রী ত্রেলা ঘোষণা করলেন— এখন কাজ শ্রমিককে আবার তার পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। তাই দরকার পড়ল তাদের রাস্তার লড়াইয়ে পরাস্ত করার। কারণ শ্রমিকরা ফেব্রুয়ারিতে রাস্তায় লড়েই বুর্জোয়াদের জিতিয়েছিল।

বুর্জোয়াদের পক্ষে এই কাজটারই সুবিধা করে দিল যখন শ্রমিক শ্রেণির একটা বেপরোয়া অংশ ১৫ মে তাদের বিপ্লবী প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় জাতীয় সভায় চড়াও হল। এই ব্যর্থ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তারা তাদের সব থেকে সাহসী এবং শক্তিশালী নেতাদের পাঠিয়ে দিল বুর্জোয়াদের কারাগারে। বুর্জোয়ারা এবার প্রলেতারিয়েতকে এক চূড়ান্ত সংগ্রামে নামতে বাধ্য করল। জনসাধারণের যে কোনও সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। ন্যাশনাল ওয়ার্কশপ বন্ধ করে দেওয়া হল। বেকার শ্রমিকদের সামনে তুলে ধরা হল দুটি বিকল্প। হয় সেনাবাহিনীতে যোগ দাও, না হয় গ্রামাঞ্চলে গিয়ে মাটি কাটার কাজ নাও। দলে দলে শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে ঘোষণা করল, না, আমরা যাব না।

শ্রমিকদের সামনেও দুটি বিকল্প অবশিষ্ট থাকল। হয় অনশন, নয় লড়াই। দ্বিতীয়টাই বেছে নিল তারা। ২২ জুন প্রচণ্ড এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে তারা এর জবাব দিল। বর্তমান সমাজ যে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত তাদের মধ্যেকার প্রথম আপসহীন লড়াই সংগঠিত হল। এরই সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের শ্রেণিনিরপেক্ষতার মুখোশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

বিনা নেতৃত্বে, কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই, রসদ ছাড়া, অধিকাংশ সময়ে উপযুক্ত হাতিয়ার ছাড়াই শ্রমিকরা অতুলনীয় নির্ভীকতা ও উদ্ভাবনীশক্তির জোরে পাঁচ দিন সেনাবাহিনী, রক্ষিবাহিনী, প্যারিসের ভেতরের ও বাইরে থেকে স্রোতের মতো আসা রক্ষিবাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখল। বিস্মৃতপ্রায় জমিদারবংশের ধনী চাষি, প্যারি আর প্যারির বাইরের সব ধরনের বুর্জোয়ারা নিজেদের সব দ্বন্দ্ব সরিয়ে রেখে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই লড়াইয়ে একজোট। তারা চিরদিনের জন্য শ্রমিক শ্রেণির সমাজ বদলাবার শখ মিটিয়ে দিতে চায়।

লড়াইয়ে দশ হাজার শ্রমিক প্রাণ দিল রাস্তায়। নজিরবিহীন নৃশংসতা চালিয়ে আরও ছ'হাজার বন্দি শ্রমিককে হত্যা করল বুর্জোয়ারা। শ্রমিক অভ্যুত্থান পরাস্ত হল। শ্রমিক বিদ্রোহের আগুনে 'সৌভ্রাতৃত্ব' পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ভ্রাতৃত্ব টিকে ছিল ততক্ষণ পর্যন্তই যতক্ষণ বুর্জোয়াদের স্বার্থের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের সংঘাত বাধেনি। ২৫ জুন বুর্জোয়ার প্যারি যখন আলোকমালায় সজ্জিত আর উল্লাসে মাতোয়ারা, সর্বহারার প্যারি তখন দগ্ধ, রক্তাক্ত। ফেব্রুয়ারির বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের পরাজয়ে নয়, জুনে সর্বহারার পরাভবেই ঘটল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের প্রকৃত উদ্ভব। কিন্তু জুনের পরাজয় ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণিকে ইউরোপের শ্রমিকবিপ্লবের নেতৃত্বে উন্নীত করল, আর শ্রমিকের রক্তে লাল হয়ে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা পরিণত হল বিপ্লবের লাল পতাকায়। মহান মার্ক্সের অমোঘ উচ্চারণ ছড়িয়ে পড়ল দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণির মাঝে, 'বিপ্লবের মৃত্যু ঘটেছে— বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!' (ক্রমশ)

ভ্রম সংশোধন ঃ গত সংখ্যায় অসাবধানতাবশত বাস্তিল দুর্গ পতনের মধ্য দিয়ে ফরাসি বিপ্লবের সূচনার কালটি ১৭৮৯ এর পরিবর্তে ১৭৭৯ হয়ে যায়। এই ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরেও বৈষম্যের অতিমারি

গত দেড় বছরের করোনাবিধ্বস্ত ভারতে যথেষ্ট সংখ্যক হাসপাতাল নেই, হাসপাতালে বেড নেই, উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই, প্রয়োজনীয় সুলভ চিকিৎসা পরিষেবা নেই, পর্যাপ্ত ডাক্তার-নার্স নেই, জীবনদায়ী ওষুধ-ইঞ্জেকশন নেই, রোগ প্রতিরোধের যথেষ্ট সংখ্যক টিকা নেই, এমনকি ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীসহ কোভিড যোদ্ধাদের জীবনেরও ন্যূনতম সুরক্ষা নেই। এ তো গেল ভয়াবহ অতিমারির প্রকোপে চামড়া উঠে দগদগে ঘায়ের মতো বেরিয়ে পড়া বেহাল স্বাস্থ্যব্যবস্থার কথা। অর্থনীতি? কর্মসংস্থান? দারিদ্র? বেকারত্ব? সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে, সেখানেও নেই, নেই আর নেই।

সম্প্রতি প্রকাশিত রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্টে দেখা গেছে, 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল' বা স্থায়ী উন্নতির সূচকে আগের থেকেও কয়েক ধাপ নেমে গেছে বিজেপিশাসিত ভারত। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কার স্থান ভারতের আগে। দারিদ্র দূরীকরণ, সুস্বাস্থ্য, সকলের জন্য খাদ্যসুরক্ষা, উন্নত মানের শিক্ষা, লিঙ্গবৈষম্য রোধের মতো আরও কিছু বিষয়ের ভিত্তিতে করা এই সমীক্ষায় উঠে এসেছে এ দেশে শিশুস্বাস্থ্যের ভয়াবহ ছবি। রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের নভেম্বর পর্যন্ত দেশের শুধুমাত্র ছ'মাস থেকে ছ'বছরের শিশুদের মধ্যেই ন লক্ষ সাতাশ হাজার শিশু ভয়ানক অপুষ্টির শিকার। এই তালিকার একেবারে প্রথমে আছে বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশ এবং তাদের জোট শাসিত বিহার। শুধু এ দুটি রাজ্যেই এই অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা সাড়ে ছ'লক্ষের বেশি। কাছাকাছিই আছে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ এবং লাদাখ-লাক্ষাদ্বীপের মতো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। খোদ কেন্দ্রীয় সরকারের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক এ তথ্যকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে।

মার্কিন গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের সমীক্ষা জানাচ্ছে, অতিমারির শুরু থেকে ৭.৫ কোটি মানুষ নেমে গেছেন দারিদ্রসীমার নিচে, যাদের দৈনিক রোজগার ১৫০ টাকারও কম। এবং এই সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটির তথ্য অনুযায়ী, অতিমারির ধাক্কায় দেশের ২৩ কোটি মানুষের রোজগার নেমে গেছে ৩৭৫ টাকারও নিচে, যা ন্যূনতম মজুরি হিসাবে স্বীকৃত। অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী, পরিযায়ী শ্রমিকরা ক্রমশ ডুবে যাচ্ছেন ভয়াবহ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। সমীক্ষায় দিনের আলোর মতো উঠে আসছে আর একটা বিষয়। এই অভাব-অনটন-মৃত্যুর বিপরীতে যে আরেকটা ভারতবর্ষ, সেখানে এতটুকু কমছে না প্রাচুর্যের রোশনাই। সাধারণ মানুষের ভয়াবহ জীবনযন্ত্রণার সাথেই পাল্লা দিয়ে দেশে বাড়ছে বিলিয়নেয়ার বা বহুকোটিপতির সংখ্যা। করোনার প্রথম ধাক্কায় গত বছরের হঠাৎ ঘোষিত লকডাউনের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই। গোটা ভারত জুড়ে শ্রমজীবী মানুষের মর্মান্তিক অসহায়তা, একের পর এক গা-শিউরে ওঠার মতো ছবি। কোটি কোটি মানুষ রাতারাতি কাজ হারিয়ে পথে বসছেন, হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক দিশেহারা হয়ে হাঁটছেন মাইলের পর মাইল। কেউ অনাহারে-অর্ধাহারে-পথশ্রমে অসুস্থ হয়ে, কেউ ট্রাকের তলায়, মালগাড়ির চাকায় পিষে মারা যাচ্ছেন। বারো বছরের মেয়ে জামলো মকদম অসুস্থ শরীরে পথেই ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে, পরিযায়ী শ্রমিক শকুন্তলা পথেই সন্তানের জন্ম দিয়ে আবার সেই সন্তানকে বুকে চেপে রক্তাক্ত শরীরে পথ হাঁটছেন। ঠিক এরকম একটা সময় ফোর্বস ম্যাগাজিনে বিশ্বের ধনীদের তালিকায় তিন নম্বরে উঠে আসছে ভারতবর্ষ। দেশের বিলিয়নেয়ার বা শতকোটিপতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১৭৭, যার একেবারে প্রথমে রয়েছেন রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানি। ছ'লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক আম্বানি এখন এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তি এবং গত মার্চ থেকে অক্টোবরের মধ্যে তার সম্পত্তি বেড়েছে ১০০ শতাংশ। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের তথ্য বলছে, মুকেশ আম্বানির ভাণ্ডারে এইটুকু সময়ে যা যোগ হল, তা দিয়ে অতিমারি বিধ্বস্ত ভারতের চল্লিশ কোটি অসংগঠিত শ্রমিকের অন্তত পাঁচ মাসের দারিদ্র দূর করা যেত। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি তিন লক্ষ আটাত্তর হাজার সাতশ পঞ্চাশ কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়ে বিশ্বের ধনীদের তালিকায় ২৪ নম্বর স্থান অধিকার করেছেন।

লকডাউনের সময় দেশের ধনকুবেরদের সম্পত্তি বেড়েছে পঁয়ত্রিশ শতাংশ। এদের মধ্যে প্রথম একশো জনের ভাণ্ডারে শুধু গত বছরের মার্চ থেকে যোগ হয়েছে ১২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮২২ কোটির সম্পদ, যা দিয়ে ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ দরিদ্রতম ভারতবাসীর প্রত্যেকের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় প্রায় এক লক্ষ টাকার চেক।

মহামারির দাপটে লক্ষ মানুষের অসহায় মৃত্যুর পরেও কোভিডের টিকা পেতে সাধারণ মানুষের প্রাণ জেরবার। টিকা নিয়ে নেতামন্ত্রীরা প্রতিদিনই নিত্যনতুন মনগড়া নিয়মের গল্প ফাঁদছেন, জনসাধারণের স্বাস্থ্যের সমস্ত দায়ভার ঝেড়ে ফেলে টিকার কথা উঠলেই প্রধানমন্ত্রী এবং তার পারিষদেরা রাজ্যগুলোর ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন এবং সুপ্রিম কোর্টের চাপে ক'দিন আগে বিনামূল্যে টিকা ঘোষণার (সে ঘোষণা বাস্তবে কতটা কার্যকরী হয় দেখার) আগে পর্যন্ত বেসরকারি সংস্থাগুলোকে টিকা দেওয়ার নামে সাধারণ মানুষকে যথেচ্ছ লোটার লাইসেন্স দিয়ে রেখেছিলেন। অথচ কোভিশিল্ডের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সিরাম ইনস্টিটিউটের মালিক আদার পুনাওয়ালার সম্পত্তির খতিয়ান দেখুন। দেশের মানুষ যখন সাধ্যের বাইরে গিয়ে টাকা খরচ করেও ঠিকমতো ভ্যাকসিন পাচ্ছেন না, প্রথম ডোজ নেওয়ার পর দ্বিতীয় ডোজ পেতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে, বৃদ্ধ-অসুস্থরাও ভ্যাকসিনের জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছেন, তখন পৃথিবীর বৃহত্তম ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থার কর্ণধার পুনাওয়ালার সম্পত্তির অঙ্ক দাঁড়িয়েছে পঁচানববই হাজার দুশো পঞ্চাশ লক্ষ কোটি এবং ধনকুবেরদের তালিকায় তিনি রয়েছেন সাত নম্বরে। গত বছরের অতিমারিতে যখন বারো কোটি সাধারণ ভারতবাসী রুজিরুটির সংস্থান হারিয়ে সপরিবারে পথে বসছেন তখনই চল্লিশ জন ভারতীয় নতুন করে ঢুকে পড়ছেন বিশ্বের সবচেয়ে ধনবান ব্যক্তিদের তালিকায়। অক্সফ্যামের একটি রিপোর্ট বলছে, লকডাউনের সময় এই ধনকুবেরদের সম্পত্তি বেড়েছে পঁয়ত্রিশ শতাংশ। এদের মধ্যে প্রথম একশো জনের ভাণ্ডারে শুধু গত বছরের মার্চ থেকে যোগ হয়েছে ১২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮২২ কোটির সম্পদ, যা দিয়ে ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ দরিদ্রতম ভারতবাসীর প্রত্যেকের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় প্রায় এক লক্ষ টাকার চেক।

অর্থাৎ মূল কথাটা জলের মতো পরিষ্কার। দেশে সম্পদের অভাব নেই। নিরানব্বই শতাংশ জনগণের রক্ত জল করা শ্রমের ফসল জমা হচ্ছে এক শতাংশ পুঁজিপতির ঘরে। দেশের মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থানের কথা উঠলেই নেতা-মন্ত্রীরা টাকার অভাবের কথা বলেন। অথচ তাঁদের এবং তাঁদের পরম সুহৃদ পুঁজিমালিকদের টাকার পরিমাণ প্রতি বছর আকাশ ছুঁয়ে ফেলে। গত ১৪ মে কিষাণ নিধির অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলে এসেছেন, তিনি দেশের সেবক। দেশের মানুষ যে সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তা তিনি অনুভব করছেন, তিনিও তাঁদের যন্ত্রণার সহমর্মী। নরেন্দ্র মোদি এবং তার সাকরেদদের এ ধরনের নির্লজ্জ মিথ্যাচার নতুন কিছু নয়। কিন্তু মহামারিতে স্বজন-হারানো মানুষের আর্তনাদে যখন বাতাস ভারি হয়ে আছে, বড় বড় শহরে গণচিতা জ্বলছে, সভ্য দেশে নদীর বুকে লাশ ভাসছে, কোথাও সেই লাশ কুকুরের খাদ্য হচ্ছে— তখন সেই শবের পাহাড়ে বসে কুড়ি হাজার কোটি টাকা খরচ করে সেন্ট্রাল ভিস্তা বানাচ্ছেন দেশের প্রশাসনিক প্রধান। আসলে তিনি কাদের প্রতি দায়বদ্ধ, কাদের সহমর্মী, কাদের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ সেটা পরিষ্কার বোঝা যায় প্রতি বছর এসব সমীক্ষার ফল দেখলেই। দেশের অগণিত অভুক্ত অর্ধভুক্ত জনগণের পাশে মুষ্টিমেয় শিল্পপতির এই ফুলেফেঁপে ওঠা সম্পদের পাহাড় যখন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো প্রকট হয়ে ওঠে, তখন বড় বড় অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিকরা বিশ্লেষণে বসেন। কখনও গরিব মানুষকে ঋণ দেওয়া, কখনও স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প, কখনও আর্থিক উন্নয়ন ওপর থেকে নিচে চুঁইয়ে পড়ার তত্ত্ব হাজির করেন। আর এইসব তত্ত্বকথার আড়ালে এই বৈষম্যের আসল কারণটি তারা চাপা দিতে চান বা বাজাররক্ষার তাগিদে চাপা দিতে বাধ্য হন।

কদিন পরেই ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসের সূর্য উঠবে ভারতবর্ষের আকাশে। লাল কেল্লায় উড়বে তেরঙা জাতীয় পতাকা। প্রধানমন্ত্রী, বড় বড় নেতা মন্ত্রীরা ভাষণ দেবেন, 'শান্তি-গণতন্ত্র-উন্নয়নের' বাণী শোনাবেন। ক্যামেরার ঝলকানি আর রোড শো-এর কুচকাওয়াজের তলায় চাপা পড়ে যাবে বুভুক্ষু ভারত, সেই ভারতের কোটি কোটি মানুষের আর্তনাদ। লক্ষ ভারতবাসীর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার এই পরিণতি হল কেন? স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরেও কেন শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে ? দেশের বেকারত্বের হার কেন রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলে? দারিদ্রের জ্বালায় শ্রমিক-কৃষকের আত্মহত্যা কেন রোজের হেডলাইন হয়? আজ থেকে দুশো বছর আগে মহান দার্শনিক কার্ল মার্কস গোটা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষকে এই কেন-র সঠিক উত্তর দিতে পেরেছিলেন। মার্কসের ক্ষুরধার বিশ্লেষণ দেখিয়েছিল পুঁজিমালিকের মুনাফার উৎস কোথায়।

শ্রমিককে তার উৎপাদিত মূল্যের সমান মজুরি না দিয়ে অর্থাৎ ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে যে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয়, সেটাই মালিকের মুনাফার উৎস। সর্বোচ্চ মুনাফার লোভে শ্রমিককে ক্রমাগত শোষণ করতে করতে কমতে থাকে শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা, তৈরি হয় বাজারসঙ্কট। সেই সংকট সামাল দিতে পুঁজি চায় উৎপাদিকা শক্তিকে বন্ধ্যা করে রাখতে। শুরু হয় শ্রমিক ছাঁটাই, লক আউট, লে অফ। গুদামে শস্য পচে, অবিক্রীত পণ্য পড়ে থাকে কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না। মার্কসবাদ শুধু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ক্রমশ বাড়তে থাকা আর্থিক বৈষম্যের কারণটিই ব্যাখ্যা করেনি, দেখিয়েছে তা থেকে মুক্তির ইতিহাস নির্দেশিত পথও। যতদিন উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা থাকবে ব্যক্তির অধীনে, যতদিন উৎপাদনের উদ্দেশ্য হবে সর্বোচ্চ মুনাফা, ততদিন বাড়বে শোষণ, বাড়বে দারিদ্র। শ্রমিকদের ছিবড়ে করে ফুলেফেঁপে উঠবে পুঁজিমালিকের সম্পদ। পুঁজিবাদের খোল-নলচের মধ্যে কোনও টোটকা, কোনও প্রকল্প, কোনও দান-খয়রাতি দিয়েই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যাবে না। এর একমাত্র সমাধান সামাজিক মালিকানার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ, যেখানে মুষ্টিমেয় মালিকের মুনাফা নয়, মানুষের প্রয়োজন মেটানো হবে উৎপাদনের উদ্দেশ্য। মাটির পৃথিবীর বুকে সেই শোষণহীন স্বর্গ প্রতিষ্ঠা করেছিল লেনিন-স্ট্যালিনের রাশিয়া, মাও সে-তুং এর চীন।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনিবার্য নিয়মে আজ শুধু আমাদের দেশে নয়, গোটা বিশ্বে এই পাহাড়প্রমাণ বৈষম্য, শ্রমজীবী মানুষের হাহাকার, বিক্ষোভ। একমাত্র মার্কসবাদের মধ্যে পুঁজিবাদের মৃত্যুর চাবিকাঠিটি আছে বলেই দারিদ্র বৈষম্য-অর্থনীতি নিয়ে শত জলঘোলা হলেও এই ব্যবস্থার রক্ষকরা নেহাত দায়ে না পড়লে মার্কসের নাম মুখে আনতে চান না। অন্য দিকে এই অন্যায় বৈষম্যের বিশ্বে সমস্ত শোষিত মুক্তিকামী জনগণের সামনে সংগ্রামের অমোঘ হাতিয়ার হল মার্কসবাদ লেনিনবাদ এবং তাঁকে অনুসরণ করে গড়ে ওঠা যথার্থ বিপ্লবী দল।

জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির আহ্বানে
দেশ জুড়ে বিরসা মুণ্ডা শহিদ দিবস পালন

৯ জুন অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির আহ্বানে গভীর আবেগের সাথে ছোটনাগপুর এলাকার জমিদার, মহাজন এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত সশস্ত্র লড়াই 'উলগুলান'-এর অবিসংবাদী নেতা বিরসা মুণ্ডার শহিদ দিবস পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে এই দিনটি পালিত হল। ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় বিরসা মুণ্ডার জীবন সংগ্রামের উপর অনলাইন আলোচনা হয়। বিরসা মুণ্ডার জীবন সংগ্রাম যেভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিকদের প্রেরণা জুগিয়েছিল, সেভাবেই বর্তমান সময়ে শোষণ মুক্তির সংগ্রামের সৈনিকদেরও অনুপ্রাণিত করবে এই লক্ষ্যেই আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়াও করোনা অতিমারিতে যেভাবে কোটি কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছেন তাদের রোজগারের জন্য কর্মসংস্থানের দাবি উঠেছে। সমস্ত মানুষের বিনা পয়সায় টিকাকরণের ও প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে। কোনও আদিবাসী এবং চিরাচরিত বনবাসীদের জঙ্গলের জমি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না। যে সকল জঙ্গলের জমি দখল করে চাষবাস করে গরিব মানুষ রুটিরুজি সংগ্রহ করছেন তাদের সেই জমির পাট্টা দিতে হবে। সকল ভূমিহীনকে বসবাসের জমির পাট্টা দিতে হবে।

খনি, কারখানা প্রভৃতি তৈরির নামে কর্পোরেটদের হাতে জঙ্গল তুলে দেওয়া যাবে না। অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি ৩০ জুন থেকে ৭ জুলাই সপ্তাহব্যাপী 'হুল' 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' বার্ষিকী পালন করার আহ্বান জানিয়েছে। এই উপলক্ষে ১৯ জুন শহিদ বিরসা মুণ্ডার জীবন সংগ্রাম ও সাঁওতাল বিদ্রোহ 'হুল' (৩০ জুন - ৭ জুলাই) বার্ষিকী পালনের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন এসইউসিআই(সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ।

মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে শ্রম কোড চালুর বিরোধিতা এআইইউটিইউসি-র

কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি সমস্ত শ্রম আইনের পরিবর্তে চারটি শ্রম কোড চালু করতে চেয়েছে। এ ব্যাপারে রাজ্যগুলির মতামত চাইলে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী ২১ জুন ট্রেড ইউনিয়নগুলির সভা ডেকে তাদের মতামত চান। ওই সভায় এআইইউটিইউসি সহ উপস্থিত ৯টি সংগঠনই এই কোডের তীব্র প্রতিবাদ করে। এ সভায় এ আই ইউ টি ইউ সি শ্রমমন্ত্রীকে একটি প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবে বলা হয়, কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মালিক শ্রেণির স্বার্থে শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণের স্বার্থবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বহু সংস্থা বেসরকারিকরণ ও মালিকদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। কৃষক স্বার্থ বিরোধী তিনটি কালা কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল-২০২০ এনেছে।

এই সময়ই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ৪টি শ্রম কোড এনেছে। যার উদ্দেশ্য হল বিগত ৪৪টি শ্রম আইনের মাধ্যমে শ্রমিকরা যতটুকু অধিকার পেত, মালিক শ্রেণির স্বার্থে তাও কেড়ে নেওয়া। করোনা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অগণতান্ত্রিকভাবে লোকসভা ও রাজ্যসভায় শ্রম কোডগুলি পাশ করানো হয়েছে। এই শ্রম কোডের বিষয়ে ১০টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ৪টি শ্রম কোড বাতিলের দাবিতে দু'বার সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট সর্বাত্মকভাবে সফল হয়েছে। এই রাজ্য সহ সারা ভারতে কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ এই ধর্মঘটকে সফল করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হয়েছিলেন। তবুও বেশিরভাগ শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে কেন্দ্রীয় সরকার এই শ্রমকোড চালু করতে বদ্ধপরিকর।

শ্রমমন্ত্রীর উদ্দেশে বলা হয়, আমরা জানি, আপনার সরকার শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এই ৪টি শ্রম কোডের বিরোধিতা করেছে। তাই আমরা আশা করব, পশ্চিমবঙ্গে এই ৪টি কালা শ্রম কোড কোনও অজুহাতেই যেন চালু না হয় এবং এখনই শ্রম কোড সংক্রান্ত কোনও রুলসও তৈরি না হয়। এখনও বহু রাজ্য সরকার শ্রম কোডের রুলস তৈরি করেনি। আমরা চাই শ্রম কোডের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ধারাগুলি পরিবর্তনের জন্য আপনার সরকার বিধানসভায় আইন তৈরি করবে। এই রাজ্যে শ্রমকোড চালু না করার সকল উদ্যোগকে আমরা সর্বতোভাবে সমর্থন ও সাহায্য করব।

ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন

রাজ্যের সকল সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, সকল নাগরিকের অতি দ্রুত বিনামূল্যে টিকাকরণের ব্যবস্থা, হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা রোগীদের উপযুক্ত চিকিৎসা ও খাদ্যের সুব্যবস্থা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানো, পেট্রল-ডিজেলের উপর ট্যাক্স কমিয়ে দাম নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুতের নতুন সংযোগ সহ সকল প্রকার পরিষেবার উন্নতি, করোনা অতিমারি চলার সময় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পরিবহণ ও নির্মাণ শ্রমিক সহ সকল কর্মহীন গরিব মানুষের প্রতিটি পরিবারকে মাসিক নগদ ৭ হাজার টাকা অনুদানের দাবিতে এবং ক্রমবর্ধমান চুরি, খুন, ধর্ষণ বন্ধ করতে সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সাংবাদিক, রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী সহ জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে ১৪ জুন এস ইউ সি আই (সি) ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনী কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে স্মারকলিপি দেয়। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক বলেন, জনজীবনের এই সমস্ত সমাধানে সরকারকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে।

জীবনাবসান

বাঁকুড়া জেলায় গঙ্গাজলঘাটির গোবিন্দধাম গ্রামের দলের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড ত্রিলোচন মণ্ডল ১৭ জুন নিজ বাড়িতে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। গোবিন্দধাম অঞ্চলে তিনিই ইউনিট ইনচার্জ হিসাবে ভূমিকা পালন করতেন।

কমরেড ত্রিলোচন মণ্ডল ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে দুর্গাপুরে ডিএসপি-তে কর্মরত অবস্থায় দলের নেতৃত্বের সান্নিধ্যে আসেন এবং কাজ শুরু করেন। এআইইউটিইউসি পরিচালিত শ্রমিক সংগঠনেও যুক্ত হন। দলের যুক্তিধারা তাঁকে ক্রমাগত সক্রিয় ভূমিকা নিতে সাহায্য করে। নির্বাচনী কর্মকাণ্ডেও দুর্গাপুরে এবং নিজ জেলা বাঁকুড়াতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেন। আত্মীয়দের এবং পরিবারের সদস্যদের দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। অবসর নেওয়ার পর তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। এখানেও দলের কাজে সক্রিয় ভূমিকা নেন। বৃত্তি-পরীক্ষা, বিদ্যুৎ সংগঠন, মনীষী স্মরণ প্রভৃতি কাজে গ্রামে গ্রামে যাতায়াত শুরু করেন। বহু গ্রামে তাঁর সম্পর্ক তৈরি হয়। এ সত্ত্বেও আরও কিছু করতে না পারার আক্ষেপ ছিল তাঁর। যত দিন বাঁচি, আরও কিছু করে যাই— এই মন নিয়ে শেষ দিন পর্যন্ত উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন। দলের কর্মীদের কাছে পেলে তিনি খুব খুশি হতেন। তাদের সমস্ত সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ রাখতেন। দলের আন্দোলনের খবরে বা অগ্রগতির খবরে খুবই আপ্লুত হতেন।

তাঁর মৃত্যু সংবাদে আত্মীয়-পরিজন সহ গ্রামের বহু মানুষ তাঁর বাড়িতে আসেন। দলের কর্মীরা উপস্থিত হন। পর দিন সকালে দুর্গাপুর শ্মশানে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হলে তাঁর পরিবারের সকলে ও দলের নেতাকর্মীরা মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর প্রয়াণে দল হারাল একজন সংবেদনশীল সংগঠককে।

কমরেড ত্রিলোচন মণ্ডল লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর-১ ব্লকের নারায়ণীতলা অঞ্চলের কর্মী কমরেড সুধীর নস্কর করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২৫ মে ভোরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর।

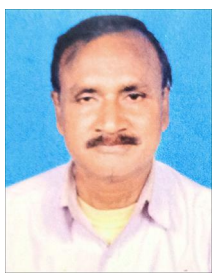

বিংশ শতাব্দীর আটের দশকে কমরেড সুধীর নস্কর দলের সংস্পর্শে আসেন। সাধারণ মানুষের ভাষাতেই রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা করার মাধ্যমে তাদের একান্ত আপনজন হয়ে ওঠার অসামান্য ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর নিরহংকার চরিত্র, সহজ সরল এবং আন্তরিক মেলামেশা সকলকে আকর্ষণ করত। দলের কর্মীদের জন্য তাঁর বাড়ির দরজা ছিল সর্বদাই খোলা। পরিবারের সকলকে তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তিনি দু'বার কাঁটাপুকুরিয়া গ্রাম থেকে নারায়ণীতলা পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কমরেড সুধীর নস্কর দলের প্রায় সমস্ত কর্মসূচি ও আন্দোলনে যেমন অংশ নিতেন এলাকার মানুষকেও আন্দোলনে যুক্ত করতেন। এলাকার নানা সাংস্কৃতিক কাজকর্ম পরিচালনা, মনীষীদের স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন ও তাতে ছাত্র-যুব-মহিলাদের যুক্ত করার কাজে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল এক অভিজ্ঞ কর্মীকে, এলাকার সাধারণ মানুষ হারাল তাদের প্রিয়জনকে।

কমরেড সুধীর নস্কর লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

সেইল-এর হেড অফিস সরানোর প্রতিবাদে ৩০ জুন ধর্মঘট সফল করার আহ্বান এআইইউটিইউসি-র

স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড (সেইল)-এর হেড অফিস এবং র- মেটেরিয়াল বিভাগ (আর এম ডি) কলকাতা থেকে সরানোর যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নিয়েছে, তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাশগুপ্ত এবং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্টিল ওয়ার্কার্স-এর সাধারণ সম্পাদক অমর চৌধুরী। ১৬ জুন এক বিবৃতিতে তারা এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ডাকা ৩০ জুনের সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ব্যয় সঙ্কোচনের এবং কাঁচামাল বিকেন্দ্রীকরণের যে কথা বলে এই অপসারণ, তাকে নিছক অজুহাত হিসাবে আখ্যা দিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এর ফলে আর এম ডি অবলুপ্ত হবে এবং লাভজনক 'মহারত্ন'-কে সামগ্রিক বেসরকারিকরণের দিকেই ঠেলে দেওয়া হবে। দেশীয় এবং বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে শুধু বিজেপি নয়, কংগ্রেস পরিচালিত পূর্ববর্তী সরকারগুলিও যে এই অপচেষ্টার শরিক বিবৃতিতে তাও উল্লেখ করা হয়েছে। সেইল কর্তৃপক্ষ ও বিজেপি সরকার এর মধ্য দিয়ে স্টিল ওয়ার্কার্সদের সংগ্রামী ঐক্য ভাঙার যে চেষ্টা চালাচ্ছে বিবৃতিতে তাঁর তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। সেইল ওয়ার্কার্সরা ৩০ জুন এর প্রতিবাদে যে ধর্মঘট ডেকেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে শ্রমিকদের দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা বেতন চুক্তি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

অস্ত্র কারখানাগুলির কর্পোরেটাইজেশনের প্রতিবাদ এআইইউটিইউসি-র

দেশের ৪১টি রাষ্ট্রায়ত্ত অস্ত্র কারখানাকে ৭টি কর্পোরেশনের অর্ন্তভুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত। ১৮ জুন এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন,

এটি অস্ত্র কারখানার সামগ্রিক বেসরকারিকরণের পথকেই প্রশস্ত করবে। পূর্বতন কংগ্রেস সরকারও এই নীতি নিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে তিনি শ্রমজীবী মানুষকে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অস্ত্র কারখানার শ্রমিকদের বিভিন্ন ফেডারেশনগুলি এর বিরুদ্ধে ১৯ জুন দেশব্যাপী যে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে এআইইউটিইউসি তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।

ঘুরপথে সিএএ চালুর প্রতিবাদে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ

নামখানায় সুন্দরবন নদীবাঁধ ও জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটি গঠিত

ঘূর্ণিঝড় ইয়াস ও পূর্ণিমার ভরা কটালের জেরে কোথাও নদীবাঁধ উপচে, কোথাও নদীবাঁধ ভেঙে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। গৃহহীন বহু পরিবার। এবার এই নদীবাঁধ রক্ষায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নান্দাভাঙাতে সুন্দরবন নদীবাঁধ ও জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটি গঠিত হল। ১৬ জুন একশোর বেশি স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিতে ৩৩ জনকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। কমিটির এক সদস্য বলেন, আমরা আজ এখানে নদীবাঁধ ও জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটি গঠন করলাম। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এই কমিটি আছে। অন্যান্য জায়গাতেও এই কমিটি গঠিত হবে। আমাদের দাবি, সুন্দরবনকে বাঁচাতে স্থায়ী কংক্রিটের নদীবাঁধ, ম্যানগ্রোভ অরণ্য গড়ে তোলা। সুন্দরবন নদীবাঁধ ও জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটির সম্পাদক অশোক শাসমল জানান, উপকূল এলাকায় সর্বত্র অঞ্চল কমিটি গঠিত হচ্ছে। ১-৭ জুলাই দাবি সপ্তাহে কমিটিগুলি স্থায়ী বাঁধের দাবিতে সেচ দপ্তরকে পোস্টকার্ডে চিঠি পাঠাবে।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এক বছরের বিদ্যুৎ বিল মকুব করার দাবি জানাল অ্যাবেকা

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এক বছরের বিদ্যুতের বিল মকুব করা, কোনও অবস্থাতেই বিদ্যুতের লাইন না কাটা, গৃহস্থ গ্রাহকদের প্রতি মাসে ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া, কৃষিতে ৩ একর পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, ক্ষুদ্র শিল্প ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ফিক্সড চার্জ বাতিল এবং এলপিএসসি/ডিপিএসসি ব্যাঙ্ক রেটে করা ইত্যাদি দাবিতে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কমজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) ১৭ জুন মুখ্যমন্ত্রী ও বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেয়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস বলেন, গত বছর থেকে করোনা মহামারী ও টানা লকডাউন এবং আম্ফান ও ইয়াস ঝড়ে রাজ্যের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অবস্থা অবর্ণনীয়। কল-কারখানা, ক্ষুদ্র শিল্প (গমকল, তেলকল, গ্রিল কারখানা, ধানকল ইত্যাদি), ক্ষুদ্র ব্যবসা বন্ধ। ট্রেন ও গণ পরিবহণ বন্ধ থাকায় এলাকার বাইরে গিয়ে কোথাও কাজ করবার উপায় নেই। লক্ষ লক্ষ পরিচারিকা-হকার-পরিযায়ী শ্রমিকের আয় বন্ধ। ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে কয়েকটি জেলার সঞ্চয় করে রাখা খাদ্যবস্তু, ঘর-বাড়ি, জামা-কাপড়, গবাদি পশু, পুকুরের মাছ, সবজি সমস্ত শেষ। সমুদ্রের নোনা জল ঢুকে চাষের জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের বহু মানুষ সরকারি রেশন ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবকদের ত্রাণের উপর নির্ভর করে জীবনধারণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই অবস্থায় দাবিগুলি অবিলম্বে মেনে নেওয়া উচিত সরকারের।

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ একই দাবিতে ১৫ জুন অ্যাবেকার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ডব্লিউবিএসইডিসিএল-এর রিজিওনাল ম্যানেজারের কাছে অনলাইনে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

জীবনাবসান

কলকাতায় দলের বেহালা পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটির প্রবীণ কর্মী কমরেড গোপাল সামন্ত ২২ মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

১৯৬৭-'৬৯ সালে বামপন্থী আন্দোলনের ধারায় যুক্তফ্রন্ট সরকার পরিচালনায় এসইউসিআই(সি)-র সংগ্রামী ভূমিকায় প্রাথমিকভাবে তিনি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে ১৯৭০ সালে মহান লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কমরেড গোপাল সামন্ত দলের সঙ্গে যুক্ত হন। গড়াগাছা অঞ্চলে তাঁর বাড়ি থেকেই মূলত দলের বেহালা পশ্চিম শাখার কাজের সূত্রপাত হয়। কমরেড গোপাল সামন্ত অত্যন্ত মূল্যবান সম্ভাবনাময় কর্মী ছিলেন। একজন পরিপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠক হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় বেশ কিছু গুণাবলি তাঁর মধ্যে ছিল। দলের বক্তব্য গভীরভাবে বোঝা, লোকের কাছে তা সহজভাবে উপস্থাপিত করা, গরিব মানুষের সাথে মেলামেশা, পোস্টার ও দেওয়াল লেখা, সবকিছুতেই তিনি ছিলেন পারদর্শী। দলের নেতৃত্বের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আস্থা এবং দলের যে কোনও সিদ্ধান্তকেই তিনি হাসিমুখে, খোলা মনে মেনে নিতে পারতেন।

তিনি নিজের পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনকেও দলের কাজে যুক্ত করেছিলেন। এলাকার নিম্নবিত্ত মানুষের ভালবাসা অর্জন করেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে অসুস্থতার কারণে কাজ করতে না পারলেও পার্টির কাজকর্মের খবর রাখতেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর দলের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হন। এলাকার সাধারণ মানুষজনও সমবেত হন। তাঁর মরদেহে দলের কলকাতা জেলা সম্পাদকের পক্ষে কমরেড ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শিলাজিৎ সান্যালের পক্ষে কমরেড অসীম রায় মাল্যার্পণ করেন। এছাড়াও যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

কমরেড গোপাল সামন্ত লাল সেলাম

কলকাতা জেলায় দলের বেহালা পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটির কর্মী কমরেড রাধারমণ প্রামানিক ৩ জুন দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অনেক দেরিতে রোগ ধরা পড়ায় তাঁর চিকিৎসার বিশেষ সুযোগ পাওয়া যায়নি। বয়স হয়েছিল ৬১ বছর।

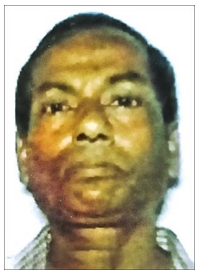

কমরেড রাধারমণ প্রামানিক বেহালা পশ্চিমে দলের কর্মী কমরেড তাপস মাইতির মামা হিসাবে দলের কর্মীদের সংস্পর্শে এসে দলের একজন হয়ে ওঠেন। তিনি এলাকার সকল কর্মীরই 'মামা' হয়ে উঠেছিলেন। অত্যন্ত উদারমনা, স্নেহপরায়ণ রাধারমণ ছিলেন দলের এক নীরব কর্মী। যখন যে দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হত, তিনি তা পালনের চেষ্টা করতেন। দলের জন্য পরিশ্রমসাধ্য যে কোনও কাজে তিনি যুক্ত থাকতেন। দলের বাংলা মুখপত্র গণদাবী যখন সাপ্তাহিক হিসাবে ছাপা শুরু হল, সেই সময় প্রেসে তিনি স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ফুল বিক্রির কাজ করতে করতেও তিনি ক্রেতাদের গণদাবীর গ্রাহক করেছেন। তাঁর সততা ও দলের কাজের প্রতি নিষ্ঠা দেখে বহু মানুষ তাঁকে ভালবাসতেন। তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও পার্টির প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে ওঠে। মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন এবং মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড রাধারমণ প্রামানিক লাল সেলাম

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com